যুক্তি

সংখ্যা ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

...

যুক্তি

সংখ্যা ২ ২০০৮

সম্পাদক
অনন্ত বিজয় দাশ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল, সিলেট

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

পরিবেশক
বইপত্র, উত্তর জিন্দাবাজার, সিলেট
তক্ষশিলা, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা
ম্যাগাজিন কর্নার, রাণীবাজার, রাজশাহী

যোগাযোগ
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল
তৃতীয় তলা, (সাইফুর রহমান অডিটোরিয়ামের বিপরীতে)
রিকাবী বাজার, সিলেট-৩১০০

মুঠোফোন : +৮৮০১৭১২৯৬৬৮১৩, +৮৮০১৭১২৯৯১৮৫৬

ইমেইল : ananta_bijoy@yahoo.com ; yukti@inbox.com

মুদ্রক
প্যারাডাইম অফসেট প্রেস
রাজা ম্যানশন, দ্বিতীয় তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট

মূল্য
বাংলাদেশ : ৫০ টাকা
বিদেশ : ৫ ডলার (ইউএসএ)

সূ চি

পুনঃপাঠ

আদেশের নিগ্রহ   আবুল হুসেন

প্রবন্ধ

শিক্ষা নিয়ে অনিয়ত ভাবনা   অজয় রায়

নাস্তিকতা—মুর্দাবাদ, বিজ্ঞানচেতনা—জিন্দাবাদ   যতীন সরকার

সমাজবাদীর জন্য জরুরি ‘ভাষা’: একটি আত্মোপলব্ধি   বেনজীন খান

সাক্ষাৎকার

প্রবীর ঘোষ

প্রবন্ধ

স্বেচ্ছামৃত্যু   সুমিত্রা পদ্মনাভন

অধার্মিকের ধর্মকথন   অভিজিৎ রায়

বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস   অপার্থিব

ধর্ম ও নারীর গল্প   নন্দিনী হোসেন

আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন   সৈকত চৌধুরী

"... মানুষ যেটুকু অনুভব করে, তার চেয়েও তারা বেশি স্বাধীন।"

—মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৩)

অবশেষে যুক্তি দ্বিতীয় সংখ্যা বের হল; অনেক অপেক্ষা-প্রতীক্ষার পর। স্বীকার করতে হবে—এ ব্যাপারে সব কৃতিত্ব পাঠকের। পাঠকের নিরন্তর অনুপ্রেরণা-উৎসাহ-তাগাদা আমাদের সাহস যুগিয়েছে শত অসুবিধা-সীমাবদ্ধতার মধ্যে যুক্তি দ্বিতীয়বার বের করার জন্য উদ্যোগী হতে। পাশাপাশি ক্ষমাও চেয়ে নিচ্ছি—সময়মত যুক্তি নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হতে পারিনি বলে।

লাথি মার্ ভাঙরে তালা! যতসব বন্দীশালায়—আগুন জ্বালা... : চারিদিকে এখন ভয়ঙ্কর দৈন্য, মহামারি, অভাব; নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দু-দফা বন্যা আর ভয়াবহ 'সিডর' ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে আমাদের দেশের প্রাণ কৃষি আর কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। দুর্ভিক্ষের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম (১/১১-এর পর) রাজনৈতিক দলগুলো ফাটা বাঁশের চিপায় পড়ছে, 'দেশ-জনগণ' যাদের কাছে এতদিন 'বাপেরবাড়ি' আর 'শ্বশুরবাড়ি'র তালুকদারি হিসেবে গণ্য হতো—চৌদ্দ শিকের ঘরে মোটা চালের ভাত খেয়ে তাদের এতদিনকার ঈশ্বরীয় জীবনের ইন্দ্রপতন ঘটেছে (স্বীকার করতে হচ্ছে, এরকম পতনের আবশ্যিক প্রয়োজন ছিল); ঠেলায় পড়ে 'ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়া' বাকি রাজনীতিবিদগণ শুরু করেছেন 'সংস্কার' নিয়ে চিরাচরিত কানামাছি খেলা। কিন্তু গত ২২ জানুয়ারির ইলেকশন নিয়ে আজকের এ পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে যাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, সেই মান্যবর ইয়াজ উদ্দিন ও আজিজ গং এখনো বহাল তবিয়তেই রয়ে গেছেন! কেন বাপু?

গত বছরের ২০-২২ আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া সশস্ত্র বাহিনীর অবিমৃষ্যকারী ভূমিকা এবং এজন্য পরবর্তীতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া ছাত্রবিক্ষোভের ঘটনায় ইন্ধন দেবার দোহাই দিয়ে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয়-সম্মানিত শিক্ষক ও ছাত্রদের গ্রেফতার, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন, শাস্তিপ্রদান, ছাত্র-শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তির বিষয়টি 'অযথা' ঝুলিয়ে রাখার মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধপরায়ণতার স্বরূপ তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। মনে হচ্ছে—রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পরও 'পাকি শাসক আইয়ুবীয় ভূত' ক্ষমতাসীনদের কারো কারো মননে-মগজে-চেতনায় এখনো রয়ে গেছে! আর দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সম্মানিত শিক্ষকদের সাথে শাসকগোষ্ঠীর এহেন অন্যায়-অন্যায্য-নিন্দনীয় আচরণের পরও—'সুশীল' বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ক্রিয়-নিষ্প্রভ ভূমিকায়, আমরা চরমভাবে ব্যথিত-লজ্জিত। পূর্বতন সময়ে গণতন্ত্র-মানবাধিকার নিয়ে যাঁদের সোচ্চার পদচারণা লক্ষ্য করা যেত, আজ তাঁদের 'জার্সি বদল কালচার' (কারো-কারো অসহায় আত্মসমর্পণ)—আবারো চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকারের মারাত্মক দীনতা ও অভাব। এহেন দুঃসময়ে আমরা স্পষ্ট করেই বলছি, সর্বদা নিঃশঙ্ক চিত্তে থাকা আর যুক্তির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই।

শক্তের ভক্ত নরমের যম : দৈনিক প্রথম আলোর সাপ্তাহিক রম্যম্যাগাজিন 'আলপিন'-এ গতবছর (১৭ সেপ্টেম্বর) ছাপানো সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ কার্টুনিস্ট আরিফের 'ছেলেমানুষী' একটি কার্টুন নিয়ে 'ধর্মানুভূতিতে আঘাতে'র অজুহাতে 'জরুরি অবস্থা' ডিঙিয়ে কয়েকটি মুখচেনা ইসলামি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক-গোষ্ঠী অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সারা দেশে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিল (অথচ যৌক্তিক-নৈতিক-মানবিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জরুরি অবস্থার মধ্যে মৌনমিছিল ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করার 'অপরাধে' দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে; শোনা যাচ্ছে 'সুষ্ঠু আইনি' প্রক্রিয়ায় বিচার চলছে!—কিন্তু ঐ প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক-পাণ্ডাদের ব্যাপারে সরকার আশ্চর্যজনকভাবে নীরব!)। প্রথম আলোর সম্পাদক, কার্টুনিস্টকে মুরতাদ-কাফের ইহুদি-নাসারাদের সোল এজেন্ট ঘোষণা করে ফাঁসি দাবি করা হল প্রকাশ্য রাজপথ থেকে। যদিও একই ধরনের কার্টুন আমরা আগেও দেখেছি—জামাতে ইসলামির মাসিক ম্যাগাজিন 'কিশোরকণ্ঠ'-এর (১৯৯৮ সালের নভেম্বর সংখ্যা) হাসির বাক্স বিভাগে। তখন কোনো ইসলাম দরদী দল বা ব্যক্তিত্ব দেখলাম না, জামাতে ইসলামি দ্বারা 'ইসলাম' বা 'নবিজি'কে অবমাননা করার অপরাধে প্রতিবাদ-মিটিং-মিছিল, নিদেনপক্ষে কোনো বিবৃতি...!

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও 'ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি'–করা নিয়ে একই দ্বিচারিতা (সোজা বাংলায় ভণ্ডামি); আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক-নারীবাদী তসলিমা নাসরিন কবেকার কোন লেখায় 'ইসলাম' নিয়ে (সমালোচনামূলক) মন্তব্য করেছেন; এরপর টেমস থেকে

সুরমা, নীলনদ থেকে গঙ্গায় অনেক জল গড়িয়েছে—অথচ এখন এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে জল ঘোলা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসরকার তসলিমার ঐ লেখাটি কথিত সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি রক্ষার নামে অনেক আগেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল! যতদূর জানা যায়, এরপর তসলিমা আর এ ধরনের লেখা লেখেননি। তাহলে এখন কেন তসলিমাকে ভারত থেকে উৎখাতের জন্য জঙ্গি-আন্দোলন? তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অভিযোগ আনা হচ্ছে? কারা মদদ দিচ্ছে এসবে?—বাতাসে অনেক কথাই শোনা যায়, বিশেষ করে 'নন্দীগ্রাম' ইস্যু... । যাহোক, এ আমাদের আলোচ্য নয়। বলতে চাচ্ছি—পাকিস্তানের মোশারফ সরকার তো কয়েক দিন আগে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত লাল মসজিদটি 'জঙ্গি' মুক্তকরণের নামে কামান দাগিয়ে গুড়ো করে দিলেন, সেনা পাঠিয়ে রক্তগঙ্গা বানালেন; অথচ তখন বা এখনও এ উপমহাদেশের কোন ইসলাম-মুসলমান দরদী আলেম-ওলামাকে পেলাম না—প্রেসিডেন্ট মোশারফকে 'আল্লাহর ঘর' মসজিদে কামান দাগানো, তছনছ করা, গণহত্যা চালানোর অপরাধে—কোনো ফতোয়া দিতে, মুরতাদ ঘোষণা দিতে—ন্যূনতম প্রতিবাদ করে বিবৃতিটুকুও মিডিয়ার মাধ্যমে পেলাম না! মসজিদের ভেতর নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে মুসলমানকে গ্রেনেড-বোমা মেরে হত্যা করলে, কামান দাগিয়ে মসজিদ চুরমার করে দিলে—ইসলামের অবমাননা হয় না! কিন্তু ইসলাম নিয়ে যৌক্তিক আলোচনা করলে কিংবা ইসলামের কোনো 'ব্যাকডেটেড চিন্তা-প্রথা'র সমালোচনা করলেই ইসলামের অবমাননা হয়। হায়!... এরকম উদাহরণ সেই মুতাজিলা কিংবা ওমর খৈয়াম-ইবনে সিনাদের সময়কার ঘটনার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়!

একটি কথা মনে পড়ছে, যদিও এখানে প্রকাশ করা বাহুল্য, তবে অপ্রাসঙ্গিক নয়—আজ যারা (বিশেষ করে মৌলবাদীরা) ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ কিংবা মুতাজিলাদের মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ 'মুসলিম' মনীষী-বিজ্ঞানী, 'ইসলামি চিন্তাবিদ' হিসেবে অভিহিত করেন (ইউরোপীয়দের সাথে টেক্কা দিবার স্বার্থে), বুক ফুলিয়ে প্রচার চালান ('ইবনে সিনা ট্রাস্ট' ধর্তব্য),—তাদের একটু কষ্ট করে ইতিহাসের পুনঃপাঠের অনুরোধ জানাচ্ছি। তৎকালীন মধ্যএশিয়ার শাসকগোষ্ঠী-মৌলবি-সমাজপতিরা কথিত মুসলিম মনীষী-বিজ্ঞানীদের মুক্তচিন্তা-যুক্তিবাদিতা চর্চা করার কারণে কী পরিমাণ নির্যাতন-নিষ্পেষণ চালিয়ে, 'কাফের', 'মুরতাদ' ঘোষণা করে সমাজচ্যুত করেছিল, ঘরবাড়ি-বইপত্র পুড়িয়ে দিয়েছিল, প্রাণে বাঁচার তাগিদে তাঁদের পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল—এ ইতিহাস 'আত্ম-পরিচিতি'র সংকটে ভোগা বর্তমানের এ গোষ্ঠীটি বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু মুক্তমনা-যুক্তিমনস্ক মানুষ বিস্মৃত হয়নি, হতে পারে না। শুধু মধ্যএশিয়ার মনীষী কেন,—আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল, বাংলার নারী জাগরণের অগ্রপথিক বেগম রোকেয়া, শিখা'র আবুল হুসেন'কেও তো 'মুরতাদ' ঘোষণা করেছিল, লেখনী বন্ধ করার জন্য প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল তৎকালীন মুসলিম সমাজপতিরা। তাই আজো যারা পুনরায় আরজ আলী মাতুব্বর, আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন-এর বিরোধিতা করেন, উৎখাতের প্রচেষ্টা চালান তাঁদের মত-মননকে, তখন এদের জন্য করুণাই হয়! ভাবনা হয়,—এদেরই পরবর্তী প্রজন্ম আবার হয়তো কিছুদিন পর হুমায়ুন আজাদ, আহমদ শরীফ, আরজ আলীকে 'হাইজ্যাক' করে শ্রেষ্ঠ 'মুসলিম' মনীষী, 'ইসলামি' চিন্তাবিদ বানাতে কসুর করবে না; তসলিমা নাসরিনকে বানিয়ে দেবে মুসলিম মহীয়সী নারী!

এ 'হাইজ্যাক' করার প্রবণতা শুধু মুসলিম মৌলবাদীদের মধ্যে নয়, হিন্দুদের মধ্যেও এ অপপ্রবণতা মারাত্মকভাবে লক্ষণীয়। হিন্দুরা (ব্রাহ্মণ্যবাদীরা) তো সেই কবে নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক গৌতম বুদ্ধকে 'হাইজ্যাক' করে হিন্দু ধর্মের দশাবতারে ঢুকিয়ে দিয়েছে! অথচ বুদ্ধ কখনোই ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃক প্রণীত বেদের অপৌরুষেয়তা মানেননি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি, নিজে কোনো ধর্ম প্রচার করেননি। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা শুধু বুদ্ধকে কেন, চৈতন্য থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত অনেককেই হাইজ্যাক করেছে; আগামীতে হয়তো আরও করবে... । মনে প্রশ্ন আসে, ধর্মবাদীরা কেন এত অত্যাচার-নির্যাতন-সমাজচ্যুত করার পরও মুক্তচিন্তার-যুক্তিমনস্ক মানুষকে পুনরায় 'হাইজ্যাক' করে নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলে? হয়তো অনেকের কাছে এর সুনির্দিষ্ট সমাজবৈজ্ঞানিক উত্তর রয়েছে, তবে খুব সংক্ষেপে আমাদের মনে হয়: (এক) ধর্মবাদীরা 'আত্ম-পরিচিতির সংকট' (Self Identity Crisis)-এ ভোগার ফলেই এ রকমটি করে, (দুই) আমাদের সমাজে সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে (আইনি) 'মুক্তমনা-যুক্তিবাদী' মানুষের কোনো স্বতন্ত্র স্বীকৃতি ও অধিকার নেই; যেমনটি অন্যান্য ধর্মবাদীদের আছে—ফলে সুযোগটি তারা কাজে লাগাতে পারে।

এ জীবন পূর্ণ কর... : সমাজনীতি-রাজনীতির জটিল-কুটিল আলোচনা ছেড়ে এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই। ক্ষণজন্মা এ মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিৎ? সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এককথায় বলবেন 'মানবজাতির কল্যাণ'। আমরাও তাই মনে করি; তাই তো দেখি, একেবারে শ্রমজীবী মানুষ থেকে উচ্চশ্রেণির মানুষ পর্যন্ত অনেকেই বিভিন্ন সময়-সুযোগে মানবতার পক্ষে কাজ করেন, বৃহত্তর মানবজাতির কল্যাণে স্বেচ্ছায় শ্রম দেন। তাদের এ নিঃস্বার্থ ভালোবাসায়-অক্লান্ত পরিশ্রমে মানুষে-মানুষে গড়ে ওঠে প্রীতির বন্ধন, এগিয়ে যায় মানবসভ্যতা। তাঁরা আমাদের নমস্য। তবে জীবিত অনেকে মানুষের কল্যাণে নির্দ্বিধায় নিবেদিত থাকলেও—মৃত্যুর পরও অসুস্থ মানুষের সেবা করা যায় মরণোত্তর দেহ ও চক্ষুদানের মাধ্যমে—এ বিষয়টি বেশিরভাগই জানেন না

কিংবা জানলেও এ প্রক্রিয়ায় যেতে উদ্বুদ্ধ হন না নানা কারণে (ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, ভয় ইত্যাদি)। একজন মৃতব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (চোখ, হার্ট, কিডনি, যকৃত ইত্যাদি) দিয়ে প্রায় ছয়-সাতজন অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব। বেঁচে থাকতে আমরা সবাই কমবেশি জনকল্যাণে কাজ করি, কিন্তু মৃত্যুর পরও এ অপ্রয়োজনীয় দেহ দিয়ে যখন আরো ছয়-সাত ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পায়, সুস্থ হয়ে উঠতে পারে, এর থেকে বড় মানবসেবা আর কী-বা হতে পারে? যেহেতু প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আমরা মৃতদেহকে মাটিতে কবর দিয়ে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে এমনিতেই নষ্ট করে ফেলি। আপনি জানলে অবাক হবেন, বাংলাদেশে অন্ধ-ব্যক্তির মোট সংখ্যা ১৪ লক্ষের ওপরে; এরমধ্যে কর্নিয়াজনিত অন্ধের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এবং সাড়ে তিন লক্ষ জনের এক চোখ অন্ধ (এ হিসাবটি ১৯৯৯ সালের, এখন নিশ্চয়ই আরো বেড়েছে)। অথচ দেশে বার্ষিক কর্নিয়া সংগ্রহের হার অত্যন্ত অল্প—মাত্র ১০০-১৫০। ২০২০ সালের মধ্যে সবার দৃষ্টি পুনরুদ্ধার করতে হলে আমাদের প্রতি বছর ৩১ হাজার করে কর্নিয়া সংগ্রহ করতে হবে। এটা কী সম্ভব? মোটেই অসম্ভব নয়। বাংলাদেশে বর্তমান গড় মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৭.৮ করে প্রতি বছর প্রায় ১১ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করেন; এ উৎসের শতকরা মাত্র তিন ভাগ সংগ্রহ করতে পারলেই বছরে প্রায় ৩৩ হাজার কর্নিয়া সংগ্রহ সম্ভব। তবেই আমরা দেশ থেকে স্বল্পতম সময়ে কর্নিয়াজনিত অন্ধত্ব দূর করতে পারবো। তাই বিশাল এ কর্মযজ্ঞে সফল হতে হলে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। এ দায়িত্ব আপনাকে-আমাকে মানবকল্যাণকামী সবাইকে নিতে হবে। আপনি কি রাজি আছেন? আপনার-আমার সর্বশেষ দান দিয়ে একজন ব্যক্তি পুনরায় দৃষ্টি ফিরে পাবে, এ সুন্দর পৃথিবী অবলোকন করতে পারবে—এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে!

মরণোত্তর চক্ষুদান নিয়ে অনেকের মধ্যে ভ্রান্ত ভয়-কুসংস্কার কাজ করে। আমাদের জানা মতে কোনো ধর্মেই মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং এটি স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ মনে করেন—চক্ষুদান করা মানে, মৃত্যুর পর চোখ খুলে নিয়ে যাবে, দেহের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে; মোটেই তা নয়, চোখ চোখের জায়গাতেই থাকবে, দেহের সৌন্দর্য একটুও নষ্ট হবে না। শুধুমাত্র (মৃত্যুর ৬ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই) ডাক্তার এসে চোখের ভিতরের সাদা অংশটুকু (কর্নিয়া) বের করে নিবেন, সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন (কর্নিয়া সংগ্রহের এ পদ্ধতিকে বলে Keratoplasty) এবং এরপর আলতো করে চোখের পাতা বন্ধ করে দেয়া হবে; বাহির থেকে দেখে বিন্দুমাত্র বোঝার কোনো উপায় নেই যে চোখের কোনো পরিবর্তন ঘটেছে।

বাংলাদেশে একমাত্র সন্ধানী-ই (১৯৭৫ সালের অন্ধত্বমোচন আইন এবং ১৯৯৯ সালের মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইনের মাধ্যমে) মরণোত্তর চক্ষুদান সংগ্রহ করে থাকে (যোগাযোগ: সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি ও সন্ধানী আন্তর্জাতিক চক্ষুব্যাংক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন ও ফ্যাক্স : ০২-৮৬৪০৪০। ঢাকার বাইরে যারা, তারা স্থানীয় মেডিকেল কলেজের সন্ধানী জোনে যোগাযোগ করতে পারেন)। আর মরণোত্তর দেহদানের জন্য নিকটস্থ সরকারি মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগে যোগাযোগ করুন। এজন্য প্রয়োজন হবে পরিবারের দুজন সদস্যের সম্মতিসূচক নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে একটি এফিডেভিট। বাংলাদেশে অনেকেই মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না আর মৃতদেহ থেকে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি ভাবতে পারে না, তাই মরণোত্তর দেহদানের হার অনেক অনেক কম। অথচ বাংলাদেশে শতশত রোগী হৃৎপিণ্ড, কিডনি, যকৃৎ নষ্ট হয়ে গেলে টাকার অভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিনে প্রতিস্থাপন করতে পারে না বলে, মারা যায়। কিন্তু 'ব্রেন ডেথ' রোগীর মৃত্যুকে মেনে নিয়ে ঐ মৃতদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করলে (রোগী আগেই দান করে গেলে কিংবা আত্মীয়-স্বজন রাজি থাকলে) অন্য অসুস্থ রোগীর শরীরে প্রতিস্থপন করা যায়; অসুস্থ রোগীটি পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠবে, পাশাপাশি দান করা রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বেঁচে থাকবে (তবে খেয়াল রাখবেন, সংক্রামকরোগে মৃত্যু হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করবেন না)। চাইলে দেহ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেওয়ার পর ঐ দেহকে নিজ-নিজ রীতি অনুযায়ী সৎকার করা সম্ভব কিংবা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের গবেষণার জন্য দিয়ে দিতে পারেন।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য প্রয়োজনে সবরকম সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করতে হবে; মানবিক দিক বিবেচনা করতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই যদি পরের তরে না হয়ই, তবে কে হবে আর? সবশেষে এ অংশটুকু শেষ করতে চাই দ্রোহী-যুক্তিবাদী মনীষী ড. আহমদ শরীফের (১৯৯৫ সালে লিপিবদ্ধ করা) 'মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান'-এর অসিয়তনামা থেকে একটি উক্তি দিয়ে—"চোখ শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ, আর রক্ত হচ্ছে প্রাণ-প্রতীক। কাজেই গোটা অঙ্গ কবরের কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাই তো বাঞ্ছনীয়।"

যুক্তি নিয়ে আরো কিছু কথা... : বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি'র সমন্বয়ে বেশকিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ দিয়ে সাজানো হয়েছে যুক্তি'র এ সংখ্যা। চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার বাইরে থেকে রচিত কয়েকটি লেখায়—আমাদের সমাজে প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত কিছু 'মিথ'কে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এদের অন্তঃসারশূন্যতাকে;—আশা করি আগের মতই যুক্তি তার

পাঠকপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারবে। আমরা মনে করি, জনগণের সমাজ সচেতনতাই পারে কাঙ্ক্ষিত সমাজ পরিবর্তন; আর জনগণকে সচেতন করে তুলতে যুক্তির কোনো বিকল্প নেই।

এ সংখ্যায় প্রকাশিত সকল লেখকের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, বিশেষ করে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ এবং ভারতীয় মানবাধিকার সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা পদ্মনাভনের কাছে; প্রত্যেক লেখকই নিজেদের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মাঝে সময় বের করে যুক্তি'র জন্য দু-কলম লিখেছেন। সাথে-সাথে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাদের লেখা এ সংখ্যায় স্থান সংকুলান করা গেল না। অনেক চেষ্টার পরও এ সংখ্যায় কিছু ভুল থেকে যেতে পারে, পাঠকের কাছে অনুরোধ—এ ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার পাশাপাশি ধরিয়ে দিতে, যাতে ভবিষ্যতে আমরা সংশোধন করতে পারি। সবশেষে স্পষ্ট করে বলতে চাই, যুক্তি'র এ সংখ্যায় প্রকাশিত সব লেখকের সব বক্তব্যের সঙ্গে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল পুরোপুরি একমত নয় এবং সম্পৃক্তও নয়; আমরা (বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল) মনে করি, প্রকাশিত সকল লেখাই লেখকগণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, অভিমত কিংবা তথ্যসংকলন। তবে আমরা চাই, এ বিষয়গুলো নিয়ে আরো গঠনমূলক আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক; পক্ষ-বিপক্ষের বক্তব্য যত স্পষ্ট হবে, ততই আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবো। তাই, প্রকাশিত যে কোনো লেখার যে কোনো বিষয়বস্তুর সঙ্গে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন এবং প্রকাশের জন্য আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন; প্রকাশযোগ্য হলে পাঠকের ভিন্নমত আগামী সংখ্যায় অবশ্যই প্রকাশ করা হবে।

আদেশের নিগ্রহ
আবুল হুসেন

{গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' ও তার মুখপত্র 'শিখা'কে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলিম সমাজে যে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাচর্চার উন্মেষ ঘটে, তা আমাদের (বাঙালির) সামাজিক-সাংস্কৃতিক লৌকিক ঐতিহ্যে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের 'কর্মযোগী' প্রাণপুরুষ হিসেবে অভিহিত মনীষী আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮),—তাঁর তীব্র ক্ষুরধার যুক্তিবাদী মননশীল প্রভূত রচনা ঔপেনিবেশিক বাঙলার প্রথাবদ্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন-স্থবির মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করে; জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞাসা, সৌন্দর্য পিপাসা আর সৃষ্টিশীলতা। তিনি বলতেন (বিশ্বাসও করতেন)—"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" 'জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ'—আবুল হুসেনের রচনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি মুসলিমদের সামনে নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটায়। এজন্য সভ্যতার অমোঘ নিয়মে ক্ষমতাশীল অতীন্দ্রিয়তার কারিগরদের কাছে চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ান তিনি; ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হয় নানা ষড়যন্ত্র-কুৎসা-বাদ-বিবাদ থেকে নির্যাতন-নিপীড়ন। এমন কী তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী বক্তব্যের সামনে টিকে থাকতে না পেরে 'কাফের' আখ্যা দিয়ে জীবননাশ করার চেষ্টা করে, তার লেখনীকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়।

আজকের একবিংশ শতকে এসেও আমরা দেখি সমাজের একই রূপ। বহিরঙ্গে প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগলেও অন্তরঙ্গে এখনো শুচিবাই, সংস্কারাচ্ছন্ন, অতীন্দ্রিয়তার প্রতি দাসত্ব। তাই আমরা মনে করি আবুল হুসেনের রচনার আবেদন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। বরং যুক্তিবোধের উন্মেষ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা আর মৌলিকচিন্তার ভাণ্ডার ঋদ্ধকরণের জন্য আবুল হুসেনের পুনঃপাঠ অত্যাবশ্যকীয়। মনীষী আবুল হুসেনের আলোচ্য প্রবন্ধটি বেনজীন খান সম্পাদিত "বুদ্ধিরমুক্তি শিখা ও আবুল হুসেন" (২০০৬, সংবেদ প্রকাশনা, ঢাকা) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।]

মানুষ মাত্রেরই একটা না একটা ধর্ম-বিশ্বাস আছে; অর্থাৎ মানুষ মাত্রই কোন না কোন ধর্মগুরুর আদেশ মেনে চলে। তার বিশ্বাস, সেই ধর্মগুরু বিধাতার প্রেরিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁর খাস উপকরণ দিয়ে সৃষ্ট এবং সাধারণ মানুষ ঢের নিকৃষ্ট উপকরণে গঠিত। এই ধর্ম-বিশ্বাস আদিম মানব-প্রকৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। ভয়, দুর্বলতা ও অজ্ঞতা, এই তিনটি মনোভাব ধর্ম-বিশ্বাসের জননী। যে জাতি অর্থাৎ যে জাতির মন এখনও ন্যাংটা বর্বর যুগের কাছাকাছি পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে সে জাতির ভয়, দুর্বলতা ও অজ্ঞতা তত বেশি। সুতরাং তার ধর্মবিশ্বাসও তত প্রগাঢ়, অর্থাৎ ধর্মগুরুর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালনে সে তত তৎপর এই ভয়ে, পাছে তার কোন অনিষ্ট ঘটে কিংবা তার ধর্মগুরু প্রদর্শিত পরলোকে দুর্গতি হয়। বলা বাহুল্য, ধর্মগুরুর আদেশ নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে পালিত হয়। এক কথায়, যে জাতি যত আদিম প্রকৃতি বিশিষ্ট, সে জাতি তত অনুষ্ঠানপ্রিয়। এই অনুষ্ঠান অর্থে আমি ধর্মানুষ্ঠান মনে করছি।

জাতির মনই তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। শুধু বয়সে তার প্রকৃতি নিরূপিত হয় না। একটি জাতির বয়স দু'তিন হাজার বৎসর হতে পারে, কিন্তু তার মন হয়ত এখনো শিশু। কাল-প্রবাহের অনন্ত পরিবর্তন, ভাঙাগড়া সে মনকে স্পর্শও করেনি। তার কারণ, এই বয়সে প্রবীণ কচি-মন বিশিষ্ট জাতি তার ধর্মগুরুকে ও তাঁর প্রচারিত বাণীর পূজায় মনকে নিশ্চেষ্ট রেখেছে—সে মন সেই ধর্মগুরুর নামের পূজায় মুষড়ে বিমোহিত হয়ে পড়েছে। সে মনে প্রকৃতির নিত্যনৈমিত্তিক ভাঙাগড়া কোন চেতনা সঞ্চার করতে পারেনি। তার ধর্মগুরুর আদেশ যে অনন্তকালের জন্য, এই উৎকট ধারণার দৌরাত্ম্য তার মনকে সজাগ হতে দেয়নি। তার মনের এই অসারতার ফলে বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি তার মমতা অত্যন্ত নিবিড় হয়ে ওঠে; মন যখন ধর্মানুশাসন মেনে চলতে-চলতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে, তখন নিয়ত পরিবর্তনশীল এই জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি তা বোঝাপড়া করবার মত শক্তিও ক্রমশঃ তার বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন বিধাতার দেওয়া এই অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ মানবজীবনের একমাত্র সম্বল তার পক্ষে হয়—কয়েকটি ধর্মসূত্র ও গুটিকতক ধর্মানুষ্ঠানে আসক্তি। সে মনে করে, এই আসক্তিতেই তার মুক্তি, উহা যে মুক্তির সহায় মাত্র এই ধারণা হতেও সে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এবংবিধ ধর্মাসক্তির সঙ্গে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ হাত ধরাধরি করে চলে। তাই দেখতে পাই, মানবের ইতিহাস ধর্ম-বায়ুগ্রস্ত মানুষের পরস্পর দ্বন্দ্ব-দ্বেষাদ্বেষি কলঙ্কে অতি নির্মমভাবে কলঙ্কিত। এ কলঙ্ক অপনোদন করতে হলে মানবের প্রতি পরস্পর প্রীতিই চরম ধর্ম বলে ধরতে হবে। বিশেষ-বিশেষ ধর্মের বিশেষ-বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যটিকে লক্ষ্য করে বর্তমান জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মানুষের প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কোন ধর্ম সর্বকাল সর্বদেশ ও সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ ধারণা যে-জাতির আছে সে জাতি নিতান্ত হতভাগ্য এবং বলতে হবে মন সভ্যতার নিম্নস্তরে পড়ে নীরস ধর্মাদেশের মরু-বালুকায় আপনার

জীবনস্রোত হারিয়ে ফেলেছে। ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রণিধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, সমস্ত ধর্মেরই মূলসূত্র হচ্ছে দুইটি, যথা—(১) বিশ্বের সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা একজন আছেন এবং (২) মানব মাত্রই মৃত্যুর অধীন। এই হেতু মৃত্যু পর মানুষ অন্যলোকে প্রবেশ করে। এক কথায় বিশ্বস্রষ্টা (রব্বুল আলামিন) ও পরলোক এই দুইটিতে বিশ্বাস। এ হতে এই মনে হয়, মানুষের আদি মাতাপিতা ও আত্মীয়বর্গের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মলাভ করেছিল আর আমরা পুরুষানুক্রমে বিভিন্ন দেশ-কালের মধ্য দিয়ে এই আদিম বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে দেশকালের প্রয়োজন-অনুসারে বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করেছি। এ ধারণা যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে দেশ-কালের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে ধর্ম-বিধিসমূহ সৃষ্ট হয়েছিল তা কখনও সনাতন হতে পারে না। সে বিধি-বিধান কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তন লাভ করতে বাধ্য, নতুবা এই পরিবর্তন সুলভ মানবের নব-নব প্রয়োজন তাতে মিটতে পারে না। মানুষের প্রয়োজন ও জাগতিক অবস্থা দু'টির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। জাগতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা মানুষের নাই, তবে মানুষ তার প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত করতে পারে; কিন্তু সেই প্রয়োজনও জাগতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং মানুষ তার প্রয়োজন চিরদিন বেঁধে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারে না। কাজেই যে যুগে যে প্রয়োজন নির্ধারিত করতে যে-ধর্মাদেশ প্রচারিত হয়েছিল সেই ধর্মাদেশ পরবর্তী পরিবর্তিত নব প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে না,—যদি না সেই ধর্মাদেশ ত্যাগ করা হয় কিংবা নূতন করে তার ভিন্ন অর্থ দেওয়া হয়। এই ত্যাগ করতে কিংবা নূতন অর্থ দিতে যে ধর্মভীরু জাতি অপারগ বা শঙ্কিত সে জাতি দুনিয়ার পরিবর্তনে কোন সাড়া দিতে পারে না; যদিও এই পরিবর্তনের প্রয়োজন তাকে গ্রহণ করতেই হয়। স্রেফ তার জীবনধারণের বা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। সে পরিবর্তন তার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেই, কিন্তু সে ভীরু বলে তা স্বীকার করে না। তখন সে মুখে ধর্মাদেশ আওড়ায় কিন্তু কাজে সে করে তার বিপরীত অর্থাৎ যুগের প্রয়োজনকে বেশি সত্য বলে সে তার কাজ দ্বারা তা সপ্রমাণ করে এবং এ-ও প্রমাণ করে যে, যে যুগে সেই ধর্মাদেশ জারি হয়েছিল সে যুগের অবস্থা এখন আর নাই; কিন্তু বলতে ভয় পায় যে এখন আর সে ধর্মাদেশেরও প্রয়োজন অনেকখানি কমে গেছে এবং বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য তার অনেকখানি রূপান্তর করা আবশ্যক। এই ভীরুতাই ধর্মান্ধতা ও ভণ্ডামির জনক। তাই দেখতে পাই, খ্রিস্টান পাদ্রি বাইবেল হাতে করে শপথ নিয়ে মিথ্যা বলছেন—মুসলমান মোল্লাজি ধর্মোপদেশ দিয়ে তার উল্টা কাজ করছেন—হিন্দু পুরোহিত মন্দির প্রাঙ্গনে বীভৎস লীলায় প্রমত্ত। এগুলি ভণ্ডামির চরম দৃষ্টান্ত বটে, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ উদাহারণ খুঁজবার জন্য আদৌ পরিশ্রম করতে হবে না। ধরুন, হিন্দুর ছোঁয়াছুঁয়ি, মুসলমান ঘৃণ্য, তাঁর ছোঁয়া মহাপাপ; কিন্তু হিন্দু আজ স্টিমারে মুসলমান বাবুর্চির হাতের শুরুয়া খাচ্ছেন, তার হাতের পানির লেমোনেড খাচ্ছেন ইত্যাদি, অর্থাৎ খেতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ সেটা যুগের প্রয়োজন। সেইরূপ মুসলমানের জীবনে নামাজ-রোজার সঙ্গেও নানা প্রকার অনাচার-ব্যভিচার বেশ মিশ খেয়ে রয়েছে। তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে মুসলমান বলেন, ধর্মাদেশ পালনের সওয়াব (সুফল) পরকালে মিলবে, এ জগতের কাজের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নাই। সুতরাং এ জগতে জীবনের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ যেমন করে হোক করা যেতে পারে। প্রায় সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষেই এইরূপে ধর্মানুষ্ঠান পালন ও অন্য কাজ দুইটি পৃথক করে ফেলেছে। তাই দেখতে পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে পাপকেও ধর্মসঙ্গত বলে চালিয়ে নেওয়া হয়েছে, ও হচ্ছে। সুতরাং আসল কথা এই, যে যুগে যে কাজকে পাপ বলা হত যে অবস্থায়, সে অবস্থার পরিবর্তনবশতঃ সে কাজটি আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় মানুষের প্রয়োজন বলে গণ্য হওয়ায়, সেটিকে আর পাপ বলে ধরা হয় না। এতে বুঝা যাচ্ছে, মানুষ প্রচলিত ধর্মের পরিবর্তন কাগজে কলমে না করলেও বা না-করতে রাজি হলেও হাতে-কলমে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে যুগ-ধর্মের নিপীড়নে। আমার মনে হয়, যদি মানুষের সমাজ এই হাতে-কলমের পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গে কাগজে-কলমে চালিয়ে নিত, তা হলে মানুষের ধর্মের নিগ্রহ ও বিড়ম্বনা অনেক কমে যেত এবং ধর্মের নামে মানুষের রক্তারক্তি ও নানা অধর্মের ইতিহাসও অনেক ছোট হয়ে পড়ত। দুইটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি বোধহয় আর একটু পরিষ্কার হয়ে আসবে। আমার এক আত্মীয় খুব বনিয়াদি ঘরের সন্তান বলে বড়াই করতেন এবং পিরগোষ্ঠীর বংশধর বলে সকলের সামনে আস্ফালন করতেন, কিন্তু বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা তাঁর কিছুই ছিল না। অগত্যা পেটের দায়ে তিনি চৌকিদারের কর্তা দফাদার হয়ে বসলেন। গ্রামের গণ্ডমূর্খ লোকের নিকট তাঁর প্রতিপত্তি কি! যে তাঁর অবাধ্য হয়ে বসত তাকে তিনি পিঠামোড়া দিয়ে বাঁধতেন এবং চোর সাব্যস্ত করবার জন্য মিথ্যা প্রমাণ খাড়া করতেন। বেচারা তখন তাঁকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে রেহাই পেত। এই ছিল তাঁর পেশা। অথচ তিনি পূর্ব-পুরুষ হতে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত একটি জীর্ণ মসজিদের খাদেম বলে পরিচিত থাকায় লোকে তাঁকে পিরের মত মান্য করত ও কেউ-কেউ তাঁর নিকট হতে দোয়া, তাবিজ, পানি-পড়া, তেল-পড়া,ও তাঁর শ্রীচরণ-ধূলা পর্যন্ত নিতে দ্বিধাবোধ করত না। মসজিদে যে-সব সিন্নি, ছাগল মানত হত, তাও তাঁর উদরস্থ হত। তাঁর মসজিদ-সেবা-করা আয়ের দিক থেকে দফাদারির চেয়ে যে নিতান্ত মন্দ পেশা ছিল না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি অনেক সময় তাঁর অপকর্মের ধিক্কার বা লজ্জা ঢাকাবার জন্য মসজিদের প্রাঙ্গনে বসে-বসে ধর্ম ও সংসার দুইটি পৃথক বস্তু কেমন করে ও কেন, তাই সপ্রমাণ করবার জন্য খুব গলাবাজি করতেন। মূর্খ মুসলমান নামাজ পড়ে বেরিয়ে তাঁর ধর্মকথা শুনে দিব্যি নিশ্চিত মনে বাড়ি যেত! একবার তাঁর এই মূর্খতার বাড়াবাড়ির জবাব দিতে গিয়ে আমাকে নিতান্ত লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। গ্রামের মূর্খ মুসলমান তাঁর দলে ভিড়ে বসল। মনে-মনে এই বলে সান্তনা পেলাম, "আহ্! ইসলাম কি বিকট মৃত্যুর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে এই বাঙলার মুসলমান নামীয় কতকগুলি জীবের কাছে।" এই লক্ষ্য

করে বোধহয় আজ একদল মুসলমান বলছেন, "হাঁ ঠিক ত মুসলমান গোল্লায় গেছে, কিন্তু তাতে ইসলামের দোষ কি?" তাঁরা এই বলতে চান—ইসলাম একটি সনাতন ধর্ম, সর্বকালে সর্বদেশে সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এই দাবি গায়ের জোরেই করা চলতে পারে, যুক্তি বা মানব-ইতিহাসের ধারা বা প্রকৃতির নিয়মানুসারে সে দাবি টিকতে পরে না। আজ মুসলমান কেন ইসলামের আদেশ পুরোপুরি পালন করতে পারছে না, তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে; আর এও দেখতে হবে, সপ্তম শতাব্দীর আরব মরুর ইসলাম বিংশ শতাব্দীর শস্য-শ্যামল উর্বর দেশে কতখানি কার্যকরী হতে পারে। যদিও ইসলাম অপরিবর্তনীয় অখণ্ড সত্য সনাতন ধর্ম বলে তাকে হুবহু জীবনে গ্রহণ করবার জন্য চেষ্ট করা হয়, সে চেষ্টা নিছক অত্যাচারেই পরিণত হবে, এবং যার উপর সে চেষ্টা হবে সে বিদ্রোহী হয়ে তার জীবন দিয়ে দেখাবে যে, 'আমি ইসলাম মানি না; কারণ মানতে পারি না বা মানতে ইচ্ছা হয় না।' বর্তমান মুসলমান সমাজে এই ধর্মদ্রোহী মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে; তার কারণ ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ জন্মাতে গিয়ে ধর্মপুরোহিতগণ তাঁদের শিষ্যগণের জীবনকে চেপে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছেন। তাঁরা জীবনের সহজ গতিকে রোধ করেছেন! এই ধর্মদ্রোহিরা সমাজের বুকে দিব্যি আরামে দিন কাটচ্ছে, কিন্তু তারা মুখে স্বীকার করছে না যে তারা ধর্মদ্রোহী; কারণ ইসলামের প্রশংসায়, ইসলামের অনুষ্ঠানগুলির ফজিলত বর্ণনে তারা শত-মুখ। সমাজপতিগণ এই মৌখিক প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে তাদের শত ছিদ্র, শত অপরাধ তুচ্ছ বলে গণ্য করে সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। 'ইসলাম যে মানুষের জন্য, মানুষ যে ইসলামের জন্য নয়'—এ কথা বুঝবার মত বুদ্ধি তাদের আজও হয় নাই। তাই দেখি, শুধু অনুষ্ঠান পালনে বড় অথচ মানুষ হিসাবে পাষণ্ড নরাধম এমন মুসলমানও মাত্র বাহ্যিক নিদর্শনের বলে সমাজে বেশ খাতির পায়।

কিছুদিন পূর্বে জনৈক আমেরিকান পর্যটক মধ্য-এশিয়া ঘুরে পারস্যের উত্তর সীমান্তে এসে একজন অগ্নি-উপাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করলেন। তাঁর সঙ্গে তিনি কিছুদিন পারস্যের নানাস্থানে নানা লোকের সাথে আলাপ করে ও পারসিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা লক্ষ্য করে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রাচীন পারসিদের চেয়ে বর্তমান পারসিগণ মিথ্যাবাদী বলে আমার মনে হচ্ছে, এর কারণ কি?" উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক ত, তার কারণ আবহাওয়ার পরিবর্তন। সে জেন্দাবেস্তার যুগ আর নাই। আবেস্তা আমাদের বর্তমান সমস্যা কিছুই সমাধান করতে সহায় হয় না। মানুষের পেটের দায় এমন নিষ্ঠুর হয়েছে যে, মিথ্যা এখন অবলম্বন না করে উপায় নাই।" পর্যটক শুনে তাঁর খাতায় নোট করে রাখলেন তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণের জন্য। প্রতিপাদ্য বিষয়টি এই যে, "দুনিয়ার সর্বত্র আবহাওয়া পরিবর্তন লাভ করেছে ও করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে।" অধ্যাপক Huntington সাহেবের 'Pulse of Asia' ও 'Climate and Civilisation' নামক দুইখানি গ্রন্থে এই পর্যটকের কথা ও এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ আছে।

আমি বলছিলাম, কালের পরিবর্তনের, অবস্থার বিপর্যয়ে ধর্মশাস্ত্রের কথা মানুষ পুরোপুরি পালন করতে পারে না। তখন ধর্মভীরু ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্রকে অপরিবর্তনীয় মনে করে মানুষের প্রতি দোষারোপ করে। আজ মুসলমানদের মনোভাবও (attitude) তাই। মুসলমান আজ তেরশত বৎসরে আদর্শ অক্ষরে-অক্ষরে পরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করতে সামর্থ হচ্ছে না। 'এজন্য দোষ মুসলমানের, ইসলামের নয়; ইসলাম-বিধি অপরিবর্তনীয়।'—এই attitude-এর ফলে মুসলমান আপন দোষ দূরীভূত করতে সক্ষম হচ্ছে না; তারা অনুষ্ঠানগুলি পালন করছে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে—কেবল অভ্যাসের বলে; কিন্তু বুদ্ধি ও অন্তর তাতে নাই। তাই তাদের নিকট ধর্ম ও সংসার বিভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। "সংসারের উন্নতির জন্যই মূলত ধর্ম-বিধানের সৃষ্টি"—এ-কথা তারা স্বীকার করতে চাচ্ছে না। ধর্ম-বিধির এবংবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করেই আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছি। এই বিধি-বিধান বা ধর্মগুরুর আদেশের নিগ্রহ হতে মুক্তি না পেলে মুসলমান তা মানুষ হবেই না, বরং ইসলামও কেবল পুঁথিগত dead letter হয়েই থাকবে, যেমন কোরান-হাদিস বাঙলার সাধারণ মুসলমানের নিকট বন্ধ-করা (sealed) একখানি পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই নয়, যে-পুস্তক হতে তারা কিছুই গ্রহণ করতে পারে না বা যার কথা শুনেও তারা তাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে না অর্থাৎ পারছে না। তবে অনুষ্ঠান পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে তারা এখনও মুসলমান। তাই মাত্র টুপি, লুঙ্গি, দাড়ি, এই বাহ্যিক নিদর্শন দ্বারাই তারা তাদের মুসলমানত্ব প্রমাণ করছে। কোরান-হাদিসের সমস্ত বিধি-নিষেধের ফল মুসলমানের জীবনে শুধু টুপি, লুঙ্গি, দাড়িতেই প্রকাশ পেয়েছে; তার বাইরে মুসলমানের আর কি-কি নির্দশন চাই মানুষের দিক থেকে, তার প্রতি লক্ষ্য আমাদের সমাজপতিদের আছে বলে মনে হয় না। তা যদি থাকত তা হলে মসজিদের সামনে বাজনা এই অতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে নরহত্যায় আমরা প্রবৃত্ত হতাম না। এ কথা আরো মনে হয় যখন দেখি মসজিদের উপাসকগণের অনেকেই গুণ্ডামি জিনিসটা একটা আমোদজনক ও কতকটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলে মনে করে।

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামও কতকগুলি আদেশ ও নিষেধের সমষ্টি মাত্র। এই আদেশ-নিষেধ মেনে চললে অনন্ত সুখ (বেহেশত) ও লঙ্ঘন করলে অনন্ত দুঃখ (দোজখ) ভোগ করতে হয়। দোজখের ভয় ও বেহেশতের লোভই মুসলমানকে ইসলামের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু দোজখ ও বেহেশ্‌তের বর্ণনা হতে কোন মুসলমানই তার প্রকৃত স্বরূপ বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করতে পারে

না, কেবল বিশ্বাসই একমাত্র সম্বল। প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধি যে বস্তুকে ধরতে পারে না, বিশ্বাস দ্বারা তাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। বুদ্ধির প্রয়োগ যেখানে অনাবশ্যক বা অনর্থক সেখানে বিশ্বাস শিথিল হতে বাধ্য। তাই মুসলমানদের কার্যকলাপ দেখলে বেশ বুঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমান দোজখ-বেহেশ্‌তের বিশেষ পরোয়া করে না। কোন অজ্ঞেয় কালে মৃত্যুর পর সেই দোজখ-বেহেশতের বাটোয়ারা হবে। এই বিশ্বাস মানুষকে তার নিত্য-প্রয়োজনের পীড়াপীড়ি হতে উদ্ধার করতে পরে না। সুদূর-ভবিষ্যতের অনন্ত সুখের লোভ ত্যাগ করে আশু সুখপ্রয়াসী হওয়া মানুষের প্রকৃতি। সুতরাং সুদূর ভবিষ্যতে সুখের লোভ দেখিয়ে যে ধর্মগুরু বর্তমানের সুখ ত্যাগ করতে হুকুম করেন। তিনি মানুষের প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন। ফল দাঁড়ায় এই, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধাবশতঃ শিষ্যগণ তাঁর হুকুম-মত চলে ও বর্তমান সুখের লোভ ত্যাগ করে বটে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তারা (শিষ্যগণ) চরম স্ফূর্তিতে আপন-আপন প্রকৃতির হুকুমই মেনে চলে। এত স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃতি জিনিষটি ধর্মগুরুর বুদ্ধি-কল্পনা-অনুভূতি প্রসুত হুকুমের চেয়ে অনেক বেশি সত্য, এবং এই সত্যই যুগে যুগে মানুষের সমাজে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। যে ধর্মগুরু এই সত্যের প্রকাশকে চিরস্তায়ী কতকগুলি বিধি-নিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে চান, তাঁর সম্বন্ধে এইটুকু বলতে চাই যে, স্বরচিতি বিধি-নিষেধগুলির প্রতি তাঁর অত্যন্ত মোহ জন্মে যায় এবং সেই মোহের দুর্বলতাই তাঁর ব্যক্তিত্বেও প্রাণ ও রসকে অনেকখানি চেপে রেখে দেয়। তজ্জন্য তাঁর অনুভুতি ও প্রাণের রস তাঁর অনুবর্তিগণের জীবনে সঞ্চারিত হতে পারে না। কারণ তারা সেই হুকুমগুলিই চরম বলে ধরে বসে কিন্তু তার উৎপত্তির কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়ে। স্পষ্ট বলতে যে অনুভূতির বহ্নিতে ধর্মগুরু দগ্ধ হয়ে তাঁর বিপদগামী সমাজকে পদ দেখিয়ে ছিলেন তার রূপ সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যগণ ধারণাও করতে সমর্থ হয় না। কারণ সে আপন কৃতিত্বে মুগ্ধ ধর্মগুরুর জীবন তাদের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। সে জীবনের ভয়-উল্লাস, শঙ্কা-উদ্বেগ আবেগ উৎসাহ প্রভৃতির ধারা যদি জীবন্ত হয়ে শিষ্যগণকে অনুপ্রাণিত করতে না পারে এবং তার রচিত বিধি-নিষেধগুলির উদ্দেশ্য তারা ধরতে না পারে, তবে সে বিধি নিষেধ কলের পুতুলের মত শুধু পালন করার জন্যই পালন ক'রে যাওয়া চরম আহাম্মকি। তাতে বুদ্ধি বিকশিত হতে পারে না, বরং তাতে মানব-প্রকৃতির সহজ গতি রুদ্ধ হয়ে যায় ও ধর্মনিষ্ঠতার দাম্ভিকতা ও আস্ফালনই প্রবল হয়ে ওঠে; ফলে সকল শুভ চেষ্টায় শৈথিল্য ঘটে। পক্ষান্তরে শিষ্যগণ ধর্মগুরুর ব্যক্তিত্বে অসাধারণত্ব প্রমাণ করার জন্য নানা কাব্য-উপকথা আবর্জনায় তাঁর মনুষ্য-প্রকৃতি বিশিষ্ট জীবনের বহুধা বিকাশকে ঢেকে ফেলে। এতে করে হুকুমই বেশি করে তাদের পেয়ে বসে তাঁর জীবনের চেয়ে যে জীবনের সমস্যা ও প্রয়োজন সেই হুকুমের জন্ম দিয়েছিল। সেই সমস্যা ও প্রয়োজন নিয়ত পরিবর্তনশীল, সুতরাং পরবর্তী যুগে যদি ঐ সমস্যা ও প্রয়োজন পরিবর্তন লাভ করে থাকে, তবে সঙ্গে-সঙ্গে সে হুকুমেরও পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ-কথা ধর্মের জোশে প্রমত্ত শিষ্যগণ কিছুতেই বোঝে না। তারা সেই হুকুমকেই চরম বলে মনে করে।

সকল ধর্মাবলম্বিদের পক্ষেই এ-কথা খটে। খ্রিস্টানগণ যিশুর জীবন ফেলে তাঁর হুকুমকে আঁকড়ে ধরেছিল, কিন্তু তাঁরা যখন দেখল সে হুকুম বর্তমান জীবনায়োজনে সাহায্য করতে পারছে না তখন তাঁরা হুকুমের বিপরীত কাজ করতে বাধ্য হল; তা সত্ত্বেও তারা খ্রিস্টান রইল। ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্তমান জীবনের সত্যকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে তারা যিশুর অনেক আদেশ অমান্য করতে বাধ্য হয়েছে এবং মুখেও সে-কথা তারা স্বীকার করেছে। সেইরূপ হিন্দু, ধর্মগুরুর হুকুমকে চরম বলে ধরেছে তাঁর জীবনের সমস্যা ও বিকাশের ভঙ্গিমতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে! ফলে হুকুম পুরোপুরি পালন করতে না পারায় বর্তমান সত্যকে আশ্রয় করে নূতন হুকুম সৃষ্টি করছে ও জীবনায়োজনকে পরিপুষ্ট করে তুলছে। প্রাচীন আদেশ অমান্য করেও হিন্দু হিন্দুই থাকছে।

মুসলমানও তার ধর্মগুরুর জীবনের সমস্যা ও বিকাশের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর হুকুমকে চরম বলে ধরেছে। কিন্তু বর্তমান জীবন-সমস্যায় সে হুকুম কাজে লাগাতে পারছে না। ফলে সে মুখে বলছে, সে হুকুম মানছে, কিন্তু কাজে তার বিপরীত করছে, কারণ সে জানে না সে হুকুমের উদ্দেশ্য কি ছিল এবং কোন অবস্থার জন্য তার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে সেই আদেশের ব্যবহার করে না। কিন্তু হিন্দু ও খ্রিস্টানের সঙ্গে মুসলমানের প্রভেদ এই যে, মুসলমান মুখে স্বীকার করে না যে, সে হুকুম অমান্য করছে। সে নিজের অপরাগতার দোষ দিয়ে বলে "হুকুম কি বদলাতে পারে? ইসলামের বিধি-নিষেধ কি পরিবর্তিত হতে পারে? কখনও না।" আবার যদি কোন মুসলমান বলে, "হ্যাঁ হুকুম বদলাতে হবে, দরকার হয় ছাড়তেও হবে;" তার প্রতি মুসলমান সমাজ খড়গহস্ত হয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে উদ্যত হয়।

মুসলমানও অন্যান্য ধর্মাসক্ত জাতির মত অনুষ্ঠান-প্রিয়—নানা আদেশ পালনে সতত উদ্বিগ্ন। এই সমস্ত আদেশের মধ্যে নামাজ, রোজা, অজু, গোসল, তেলায়ত, খোতবা, আজান, দরুদ, কলমা প্রভৃতি সম্বন্ধে কড়া আদেশ জারি আছে। কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে শুধু তাদের বুদ্ধির-অগম্য সওয়াবের লোভে এই সমস্ত আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে গিয়ে মুসলমানের যে চেহারা হয়েছে তা আজ অত্যন্ত চোখে লাগছে। তা দেখলে মনে হয়, ইসলাম যে সদুদ্দেশ্যে অর্থাৎ মানুষ করবার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল তা একবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। যে-সমস্ত মুসলমান এই সমস্ত অনুষ্ঠান কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে পালন করতে ব্যস্ত, তাদের

অধিকাংশের জীবন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও নোংরা। কিন্তু যারা এই অনুষ্ঠানগুলি অক্ষরে-অক্ষরে পালন না করে স্বেচ্ছামত পালন করে বা অমান্য করে, তাদের প্রতি মৌলানা সাহেবদের ফতোয়ার তীর নিক্ষিপ্ত হয় রুচিগর্হিত কদর্য ভাষার ভিতর দিয়ে। তার মজা এই যে, আজ মুসলমান সমাজ যাঁদের নিয়ে গর্ব করে তাঁদের অনেকেই অনুষ্ঠানের তোয়াক্কা রাখেন না। তাঁরা মৌলানা সাহেবদের রম্ভা দেখিয়ে কোরান-হাদিসের কথা সিকেয় তুলে রেখে দিয়ে যুগ-ধর্মের দাবি-অনুসারে কাজ করে চলেছেন—অবশ্য চুপে-চুপে। তা হলেও এই সমস্ত সাহেবিয়ানা-পরস্ত অর্থাৎ যুগধর্ম-পরস্ত মুসলমানকে মৌলানা সাহেবেরা খুব খাতিরও করেন। অনেক সময় নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, এই সমস্ত অনুষ্ঠানদ্রোহী মুসলমান কর্তারা মৌলানা সাহেবদের কথায় সায় দিয়েই চলেন। যদি তাঁরা সাহস করে তাঁদের একটু ধমকে দিতেন যে, "আপনারা করছেন কি? আর কতকাল অজু করে মসলা, হায়েজ-নেফাজের মসলা, জিহাদের মসলা শুনিয়ে বেড়াবেন? মানুষ অজু করে করুক, না-করে না করুক, দেখুন তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে জানে কিনা, কেমন করে তা হওয়া যায় তাই বলুন। শুধু বারকয়েক পানি হাতে-পায়ে দিলেই যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া যায় না, তা জোর করে বলুন। শরীর ও মনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যই প্রকৃত লক্ষ্য—অজু একটি উপায়। নামাজ-রোজা ইত্যাদি সম্বন্ধেও তার মূল উদ্দেশ্য কি ও তা হচ্ছে না কেন, তা বুঝিয়ে দেন। তা না করে নামাজ পড়লে সত্তর হাজার সওয়াব হয়, দরুদ পড়লে ফেরেশতা এসে আর্শীবাদ করে, এসব কথা শুনিয়ে লাভ কি? এগুলির দ্বারা বর্তমান জগতে আমরা কতদূর মনুষ্যত্ব লাভে সক্ষম হতে পারি, সেইটিই দেখিয়ে দিন। যদি এগুলি ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্য সহজ উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে তবে পুরাতন অনুষ্ঠান পালনের জন্য তত বেশি কড়াকড়ি প্রয়োজন নাই"—তা হলে মুসলমান সমাজের চেহারা ফিরে যেত। অনুষ্ঠান পালন ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অকুতোভয়ে স্বীকার করে নিতে হবে। অনুষ্ঠানই চরম নয়, অনুষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটি প্রধান—তাই হাসিল করার জন্য বিধি-নিষেধ ও ধর্মগুরুর আদর্শ মাত্র একটি উপায়। সুতরাং অনুষ্ঠান পালন করলেই যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে, এরূপ ধারণাও ভুল। পালন করার সময় বুদ্ধি যদি ঘুমিয়ে থাকে, তবে তাতে সে উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ হতে পারে না। বস্তুতঃ দেখা যায় পুরাতন অনুষ্ঠানাসক্ত মানুষের বুদ্ধি জাগ্রত নয়, এজন্য সে অনুষ্ঠানের খাতিরেই অনুষ্ঠান পালনে হাজির হয়েই কর্তব্য সারা করে; বুদ্ধি দ্বারা সে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিচার করতে সমর্থ হয় না, বিচার করতে চায় না।

এই উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীন অনুষ্ঠান-প্রিয়তার বিষময় ফল কিরূপ হয়, তা বর্তমান বাঙলার সাধারণ মুসলমানের জীবন ও তাদের অনুষ্ঠানাসক্তি দুইটি মিলিয়ে দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায়। শুক্রবারে মসজিদে গেলে চোখে এসে ঠেকবে এমন কতকগুলি চেহারা—যার প্রায় প্রত্যেকের মাথায় একটি তৈল্লাত টুপি—গায়ে একটি ঘর্ম-তিক্ত গন্ধ-বিশিষ্ট পিরহান বা চাদর বা গামছা, পরিধানে একখানি মলিন-কৃষ্ণ লুঙ্গি। কিন্তু এদের অজু গোসলের মস্‌লা কণ্ঠস্থ। এরাই তিনবার নাকে পানির স্থানে যদি অন্যমনস্ক হয়ে চারবার নাকে পানি দিয়ে বসে তবে তারা পুনরায় সময় নষ্ট করে অজু দোহরায়। ফলে, অজু করতে গিয়ে যথার্থ পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল করার পরিবর্তে তারা শুধু খানিক গণিত প্র্যাকটিস করে। নামাজের সময়ও তাই—রেকাত গুণতে-গুণতে প্রাণান্ত–দরুদ-কলমা পড়ার সময়ও শ, হাজার, লাখ ঠিক করতেই তার উদ্দেশ্য উবে যায়। শুক্রবারের দিন খোতবার প্রহসনও কি চমৎকার! মোল্লাজি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে লহন দোরস্ত করে সুর-ঝঙ্কারে মান্ধাতার আমলের রচিত কতকগুলি আরবি বাক্য পাঠ করেন—কি বুঝেন, না-বুঝেন—তিনিই জানেন আর তাঁর আল্লাই জানেন—আর মোকাদির দল বসে-বসে হয় হাই তোলে, না-হয় সংসারের ব্যাপার খানিক বসে-বসে—ভাবতে থাকে, আর যারা একটু বুদ্ধিমান তারা বেশ খানিক ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে তাদের শ্রমক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দিতে থাকে।

মোট কথা, মুসলমানদের অনুষ্ঠানাসক্তির দৌড় পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তাদের জীবনের ধারা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য-মোতাবেক ত নয়ই বরং তার ঠিক বিপরীত। সোজা করে বললে এই দাঁড়ায়, অজু কর কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হও আর না-হও তার দিকে খেয়ালের দরকার নাই; নামাজ পড় কিন্তু নম্র, শিষ্ট, সত্যভাষী, দয়ার্দ্রচিত্ত, সময়নিষ্ঠ, ভক্তিমান হওয়ার জন্য তার দিকে খেয়ালের দরকার নাই, নামাজই পড় রেকাতের পর রেকাত, সে তাড়াতাড়িই হোক আর ধীরে-ধীরেই হোক তার বিশেষ হিসাবের প্রয়োজন কি? খোতবা পড়, বুঝবার দরকার নাই; জামাতে নামাজ পড়—কিন্তু একতা হোক আর না হোক তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে কাজ নাই; রোজা রাখ কিন্তু রাত্রিতে যা ইচ্ছা তাই করতে পার। ইত্যাদি... । এই সমস্ত আদেশের অর্থ যে ঐরূপই মুসলমানদের জীবনে দাঁড়িয়েছে। সত্যই যদি অনুষ্ঠান পালন সত্ত্বেও এইরূপ বিপরীত ফলই তাদের জীবনে দেখা যায়, তবে যত শীগগির এই অনুষ্ঠান পালনের দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতা হতে তাদের রেহাই দেওয়া যায় ততই তাদের মঙ্গল, মানুষের পক্ষেও কল্যাণকর। এই অত্যাচার হতে মুক্তি পেলে তাদের বুদ্ধি আর ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে বেহেশ্‌তের হুর-গেলমানের স্বপ্ন দেখবে না। তারা তখন দেখবে ও বুঝবে তাদের এই দুনিয়াই বেহেশ্‌ত, কত সুন্দর! কত মধুর! কত হৃদয়গ্রাহী! এই দুনিয়া-বেহেশতের সুখ-ঐশ্বয্যের লোভই যদি তাদের দেখান হয় তা হলেই তারা সহজে তাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাদের জীবন বৈচিত্র বিপুল-ঐশ্বর্য্যে ভরপুর করতে পারবে এবং তখনই তারা এই

ঐশ্বর্য্যের স্রষ্টাকে ভাল করে উপলব্ধি করতে পারবে। এবং আরও পরিষ্কার করে বুঝতে পারবে যে, ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মানবজীবনকে তার সমস্ত শক্তির উৎকর্ষ দ্বারা সুন্দর ও শ্রীসম্পন্ন করে তোলা। এ জীবনকে তুচ্ছ করে কোন ধর্ম-সাধনাই সার্থক হতে পারে না। যে ধর্ম মানুষের এই বিপুল জীবনের সম্পদ ও শ্রীকে বিকশিত করতে সাহায্যে করে না সে ধর্ম মিথ্যা এবং তার পূজা মানুষকে অধঃপতনের চরমে নিয়ে যায়। কিন্তু মোল্লাজি অজ্ঞেয় বেহেশতের লোভ দেখিয়ে মুসলমানকে বেশি করে ক্ষুৎপিপাসা ক্লিষ্ট করে তুলেছেন। তাতে তারা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ভুলে গেছে এবং তাদের নিদারুণ দুঃখ ক্লান্ত জীবন দিয়ে তারা সজোরে ধর্মশাস্ত্র, ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রচারক এই তিনকে উপহাস করে বলছে "ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত যারা, তাদের আবার ধর্ম কিসের?" কিন্তু মুসলমান ধর্মের পুরোহিত এই মূক প্রতিবাদের অর্থটি বুঝবেন কি?

এখন আর বোধহয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন সুন্দর করবার উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত ধর্মাদেশ ইসলামের মারফতে প্রচারিত হয়েছিল তার পরিণতি আজ সাধারণ মুসলমানের জীবনে কি কদর্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে—সে জীবনে সত্যকার ধর্মস্পৃহা ঘুচে গেছে, সে জীবন এখন আস্ফালন, অভিমান, মিথ্যা গর্ব, ভণ্ডামি, মূর্খতা ও রুচিহীনতায় পূর্ণ হয়ে উঠছে। এ-স্থলে আরও কয়েকটি আবশ্যকীয় আদেশের পরিণতি কিরূপ হয়েছে তার আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করি; যথা :—হজরত বলেছেন, (১) বিধবা বিবাহ দাও। (২) নারীকে পর্দায় রাখ। (৩) জাকাত, ফিৎরা, সাদকা দাও। (৪) তেলায়ত (কোরান ইত্যাদি পাঠ) কর। (৫) একাধিক বিবাহ করতে পার এবং আবশ্যক হলে তালাকও দিতে পার। (৬) পৈত্রিক সম্পত্তি ফারায়েজ-মত ভাগ-বাটোয়ারা কর।

এক-একটি করে ধরা যাক। এই যে বিধবা-বিবাহ ব্যাপারটি, যার প্রবর্তনের জন্য হিন্দুসমাজ আজ প্রায় একশত বৎসর ধরে নানা প্রকার চেষ্টা করছেন, এমন কি রাজ-সরকারের মারফতে আইন পর্যন্ত রচিত হয়েছে, সেই বিধবা-বিবাহ আজ মুসলমান সমাজে অনেকটা ঘৃণ্য ও লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত ও বনিয়াদি ভদ্র মুসলমানই এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁরা বিধবা-বিবাহ দিতে পর্যন্ত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন, ক্রমে তাঁদের দৌর্বল্য দারুণ হয়ে উঠছে। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কেবল কৃষিজীবী মুসলমানদের মধ্যেই বিধাব-বিবাহ একটু চলছে, কারণ বিধবা একটু বয়স্কা বলে তাদের সংসারের উন্নতির জন্য বিশেষ কাজে লাগে কিন্তু তারাও আজকাল সভ্য-ভদ্র মুসলমানকে অনুকরণ করতে অগ্রসর হচ্ছে। তাছাড়া, একটু উচ্চস্তরের বিপত্নীক মুসলমান বিধবাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাবে নাক-মুখ কুঁচিয়ে ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি, দুই বা ততোধিক স্ত্রী-বিয়োগ-কাতর ভদ্র মুসলমানও কুমারীর (Virgin) জন্য লালায়িত হয়ে উঠেন। কিন্তু লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়, মুসলমানের অনেকের বিধবার সঙ্গে পাশবিক সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠা করতে দ্বিধাবোধ করেন না, বরং বেশ লজ্জতের সঙ্গে আঁধারে সে ব্যাপার পাকা করে তোলেন এবং বৈধ-অবৈধ সম্পর্কে ভীষণ পরিণামও তারা মাথা পেতে গ্রহণ করেন। তারা বিধবাকে স্ত্রী-রূপে বাঁধাবাঁধির মধ্যে গ্রহণ করতে নারাজ। ফলে মুসলমান বিধবাগুলি নির্লজ্জ হয়ে ক্রমশঃ তাদের শরীর পুরুষের পাশবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই উন্মুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছে—স্ত্রীত্বের পবিত্রতা ও মাধুর্য হতে তারা দ্রুত বঞ্চিত হচ্ছে। এ-বিষয়ে সমাজপতিরা উদাসীন তো বটেই, বরং তারা ঐ সমস্ত অবৈধ আচারপরস্ত ভদ্র মুসলমানকেই আদর্শ মুসলমান বলে ধরেন, কারণ তারা নামাজ পড়েন। নামাজ পড়লেই সাত-খুন মাফ। কু-কর্মের চূড়ান্ত করো কিন্তু মসজিদে এসে মাথা ঠুকে যাও, তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে যাবে। কি চমৎকার ধর্ম! এইরূপ নামাজের দোহাই দিয়েই মুসলমান আজ নানাপ্রকার অনাচার-অপকর্মে নিপুণ হয়ে উঠছে। তাই বলতে ইচ্ছা হয়, "এ নামাজ এখন উঠিয়ে দিলেই বোধহয় মুসলমান তার জীবন একটু শোধরাতে পারত। নামাজ আর কু-কর্মে যেন মিতালি করে বসেছে!" পর্দা আজ মুসলমান নরনারীর পাশবিক প্রবৃত্তি প্রখর করে তুলবার জন্য একটি ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে উঠেছে। এতে তাদের দুর্বলতা, নির্লজ্জতা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা, হৃদয়হীনতা, রুচি-বিকৃতি, কাপট্য, স্বাস্থ্যহীনতা, মস্তিষ্ক-চর্চার প্রতি ঔদাসীন্য, কর্মে বিগতস্পৃহা ও আলস্য দিন-দিন বেড়ে চলেছে। নারীকে পর্দায় রাখা হয় এই উদ্দেশ্যে যে তার প্রতি পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে এবং তার সতীত্ব নষ্ট না হয় অর্থাৎ তার দ্বারা এমন কোন সন্তান-সন্ততির সৃষ্টি না হয় যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সমাজে তাদের জন্মদাতাকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হয়। এই সতীত্ব রক্ষার উপায় পর্দা; কিন্তু বর্তমান মুসলমান সমাজে পর্দা এই সতীত্ব নষ্ট করাবার চমৎকার একটি উপায়ে পরিণত হয়েছে। পর্দার অন্তরালে মুসলমান নারীর দুর্বলতা এরূপে লালিত হতে থাকে যে, তার ব্যক্তিত্য একেবারে পুষ্টিলাভই করতে পারে না, ফলে সামান্য ইঙ্গিতে বা প্রলোভনেই সে পাশবিক লালসার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে—কারণ পর্দা তাকে অতি শৈশব হতেই ঐ একটি মাত্র বস্তু অর্থাৎ সতীত্বের কথা ভাবতে অভ্যস্ত করতে গিয়েই ঐ লালসাকেই পুষ্ট করে তুলে। এছাড়া অন্য বিষয় চিন্তা করা তার ভাগ্যে জুটে না—কিংবা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করার সুযোগও তার মিলে না; কারণ তা হলে পর্দা তুলতে হয়, যেমন তার বিদ্যাচর্চার পরিধি বাড়াতে হলে পর্দার সীমা অনেকখানি খর্ব করতে হয়। মুসলমান নারীর অবরোধের পরিণাম যে কি বিষময় হয়েছে তার হিসাব দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, মাত্র তার ইঙ্গিত করলেই যথেষ্ট হবে। নারী পর্দার অন্তরালে কেমন করে স্বাস্থ্য হারাচ্ছে, অকাল-মৃত্যুর কবলে পড়ছে, সন্তান-সন্ততির হীনস্বাস্থ্য নিয়ে অহর্নিশ জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করছে, দ্রুত মেজাজের মাধুর্য ও

মানসিক স্ফূর্তি খুইয়ে ফেলে স্বামীর জীবনের কাঁটাস্বরুপ হয়ে উঠছে, তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে হলে উচ্চশিক্ষিত কতিপয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির জীবন-ইতিহাস ঘেটে দেখলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এবংবিধ নারীর সঙ্গে থেকে মন ও মস্তিষ্কের চর্চা মুসলমান পুরুষের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। প্রায় মুসলমানের সংসারে আনন্দ, স্ফূর্তি ও স্বাস্থ্যের পরিবর্তে নিরানন্দ ঝগড়াঝাটি ও রোগ-যন্ত্রণা বিদ্ধমান। এ সমস্তই কঠোর অবরোধ প্রথা বা পর্দার আশু বিষময় ফল।

আজকাল বোরকার পক্ষপাতী হয়ে অনেকে পর্দা-সমস্যা সমাধান করতে চান। অবশ্য মুসলমান নারী বহুকাল হতে বোরকা ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু এখন স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার ধূয়ায় তারা বোরকা দ্বারা পর্দা বা অবরোধে কড়াকড়ি একটু হালকা করতে চান। কিন্তু আমরা মনে হয়, 'বোরকা'ও পুরুষের, বিশেষতঃ নারীর পক্ষে অপমানজনক ও লজ্জাকর। এতে করে বৈচিত্র্য-সুখ-বিমুখ নারী স্বীয় স্বাধীনতার অপব্যবহারের পথ সহজ করে তুলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান বোরকাওয়ালিদের জীবন-কাহিনী কিছু কিছু শুনলে Reynolds সাহেবও লজ্জা পাবেন। সত্য বলতে, আজ বোরকা মুসলমান নারীর দুর্বলতার চরম নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

জাকাৎ, ফিৎরা ও সাদকা প্রভৃতির প্রচলনের দানের বহর যে বেড়ে চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মূর্খ ভিক্ষুকের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে সে কথা আর বেশি বলবার প্রয়োজন নাই। রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলে হাজার-হাজার অস্থি কঙ্কালসার মুসলমান নরনারীর কুৎসিত চেহারা চোখে এসে একাধারে ক্ষোভ, লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক করে। এই নিধারুণ ভিক্ষাবৃত্তির অনেকখানি যে বিচার বুদ্ধিহীন বদান্যতার হুকুম হতে উৎপত্তি লাভ করেছে; সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

কোরানশরিফ পাঠ (তেলায়ত) করার হুকুম আজ যেরূপভাবে পালন করা হচ্ছে, তাতে মনে হয়, তেলায়ত বন্ধ করে দিলেই মন ও মস্তিষ্কের পক্ষে পরম কল্যাণকর হবে। সকালে মসজিদের মধ্যে কেরাত করে দলে-দলে এক বর্ণ না-বুঝে শুধু সওয়াবের লোভে যারা তেলায়ত করে, তাদের বুদ্ধি যে সিকেয় তোলা থাকে, তা বলাই বাহুল্য। এই হুকুমের নিগ্রহ প্রকাশ পায় ঐ সমস্ত তেলায়তকারির মূর্খতা ও অজ্ঞতার ভিতর দিয়ে।

একাধিক বিবাহের হুকুম ও তালাকের হুকুম প্রায় সমভাবেই পালিত হয়। এই ব্যাপারেই আদর্শটি যেন পুরোপুরি পালিত হয়ে থাকে। মুসলমান বিবাহ করতেও বিলম্ব করে না, আবার তালাক দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। দুঃখের বিষয়, বিবাহের পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া ও তালাকের প্রতি ঘৃণা মুসলমানের জীবনে অতীব বিরল বললে বোধহয় অতুক্তি হয় না। অথচ বিবাহ ও তালাকের হুকুমের উদ্দেশ্য ছিল 'বিবাহ'কে অধিকতর পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে গ্রহণ করে তার উপর প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু আজ 'বিবাহ' পুরুষের পশুবৃত্তি চরিতার্থ করবার এবং তালাক তার স্বেচ্ছাচারিতা, পত্নীর প্রতি দৌরাত্ম্য ও অবিচারকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রকৃষ্ট উপায় হয়ে দাড়িয়েছে।

পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার হুকুমও অনেক ক্ষেত্রে যথার্থভাবে পালিত হচ্ছে না। এর ফলে অহর্নিশ ভাই-এ ভাই-এ কাটাকাটি-মারামারি চলছে। আদালত তার সাক্ষী। উপসংহারে এই বললে যথেষ্ট হবে যে, আজ মুসলমান ইসলামের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে দিব্যি খোশমেজাজে দিন কাটাচ্ছে; আর মোল্লাজির দল চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছেন যে ইসলাম-তরী ডুবলরে ডুবল। তাঁরা আস্ফালন করে বলেন, "ইসলাম সনাতন, ইসলামকে মজবুত করে ধর। ইসলামকে ছেড়ে মুসলমান বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।"

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যখন দেখছি মুসলমান নামধেয় মানুষগুলির মধ্যে শতকরা ৯০ জন ঠিক ইসলামের উদ্দেশ্য-সম্মত বিধি-নিষেধ মেনে চলছে না অর্থাৎ চলতে পারছে না, তখন কি করে বলি—ইসলাম সনাতন, উহা চিরকাল সর্বত্র সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য? বরং বলতে চাই, তারা মানছে না, কারণ তারা মানতে পারছে না। এতে আমি এই ইঙ্গিত করতে চাই যে, এর জন্য মানুষ যতই দোষী হউক না কেন, বিধি-নিষেধেরও কিছু কিছু দোষ আছে। মোদ্দা কথা, ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করতে গিয়ে মুসলমান আজ কতকগুলি ভণ্ড, প্রাণহীন, গর্হিতরুচি, বুদ্ধি-বিবেকহীন জীবে পরিণত হয়েছে। মুসলমান নেতৃবৃন্দ এদিকে দৃক্‌পাতও করছেন না; বরং সমস্তই ধামাচাপা দিয়ে তাঁরা সমাজে সাচ্চা বনে বসেছেন।

এর চেয়ে গভীর পরিতাপের ও লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে ? এতে মুসলমান সমাজ পরকালে দোজখে যাবে কি বেহেশতে যাবে তা বলতে পারি না, তবে এখানেই যে, দুনিয়া-দোজখে দ্রুত চলেছে তা আর বলতে হবে না। বাঙলার জেল, হাসপাতালগুলো তার প্রমাণ!

শিক্ষা নিয়ে অনিয়ত ভাবনা

অজয় রায়

'শিক্ষা' শব্দটি দিয়ে আমরা 'পাঠগ্রহণ' এবং 'পাঠদান' দুটি প্রক্রিয়াকেই বুঝিয়ে থাকি। অভ্যাস-চর্চা প্রভৃতির দ্বারা আয়ত্তীকরণ বা অর্জনই হল শিক্ষা। কাজেই শুধুমাত্র মাস্টারমশাই'র কাছ থেকে বা শিক্ষায়তনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভই শিক্ষা নয়। মানুষ বস্তুত সবচাইতে বেশি শিক্ষা লাভ করে স্বচেষ্টায়, বিভিন্ন গ্রন্থ-লেখা পাঠ করে, এবং পরিপার্শ্ব ও পরিবেশ থেকে;—প্রকৃতি হল মানুষের সবচাইতে বড় শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বারবার প্রকৃতি থেকে শেখার ওপর জোর দিয়েছেন। আর এ কারণেই তিনি 'শান্তি নিকেতন' আর 'বিশ্বভারতী' গড়ে তুলেছিলেন শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে, প্রকৃতির কোলে বোলপুরের শান্তিনিকেতন গ্রামে।

একইভাবে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, উপসলা, তক্ষশীলা, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোলাহলমুখর শহর থেকে বেশ দূরে প্রাকৃতিক পরিবেশে। আধুনিককালে অবশ্য এ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে,—বিদ্যায়তনগুলো এখন শহরের ও নাগরিক সভ্যতার অবকাঠামোর অখণ্ডিত উপাদান। এখন হল শহর থেকে যত দূরে শিক্ষায়তনের অবস্থান, শিক্ষার আলোকবর্তিকা ততই নিষ্প্রভ। গণিতের ভাষায় বলতে পারি—"শিক্ষা হল শহর থেকে দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক অপেক্ষক" (Education is the inverse function of distance from the city)।

অধুনা বাংলাদেশের যে কোন সেমিনার বা বৈঠকি আলোচনায় একটি কথা বারবার উঠে আসে তা হল আমাদের কোন শিক্ষানীতি নেই। অথচ আমরা বলি না যে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্যনীতি, আমদানি-রপ্তানিনীতি, বিচারনীতি এবং এমন কি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক দেশ-পরিচালনায় কোনো নীতি নেই। আছে কি নেই, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যাথা নেই। বাজারে চালের সরবারাহ কম হলে বা রোজার সময় বেগুনের দাম হীরার দামের কাছে পৌঁছালেও আমরা খুব বেশি চেচামেচি করি না, সরকারও খুব বেশি বিব্রত বোধ করেন না। আমরা সোচ্চারে ঘোষণা করি না যে আমাদের 'অভ্যন্তরীণ বাজারনীতি' নেই। অথচ কোনো উপাচার্যের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির বা অনিয়মের কথা সংবাদপত্রে এলে আমরা ভয়ানক ক্ষুব্ধ হই, কিন্তু কোনো মন্ত্রণালয়ের বা মন্ত্রীর দুর্নীতির খবর আমাদের ততটা বিচলিত করে না, স্বাভাবিক বলেই জনগণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কেন? এর কারণ হল আস্থা বা সম্মানের যে স্থানগুলো এখনও জনগণ লালন করে, সেগুলো হচ্ছে শিক্ষায়তন ও শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের কাছে এখনও সত্যিকার অর্থে জ্ঞানপীঠ, তীর্থস্থানের মতই পবিত্র, আর এখানকার শিক্ষকরা এখনও সমাজের চোখে জ্ঞানের আলোকবর্তিকাবাহী—তাঁরা জ্ঞান-সৃষ্টির সাধানায় নিমগ্ন। তাই এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিন্দনীয় খবর প্রকাশিত হলে জনগণ ক্ষুব্ধ হন। সাধারণ মানুষ এখনও মনে করে শিক্ষা হল জাতির মেরুদণ্ড আর শিক্ষকরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। আর এ কারণেই কোনো পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হলে, বা নকলের বন্যা বইলে, শিক্ষার নামে অশিক্ষার প্রচলন ঘটলে, শিক্ষার মান অধোগামী হলে অভিভাবক মহলে, সমাজসচেতন মানুষের মধ্যে, এমন কী সাধারণ জনগণের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র প্রতিক্রিয়া; কারণ সরকার ও বিত্তবানেরা শিক্ষাকে যতই বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত করুক না কেন, জনগণ শিক্ষাকে আর পাঁচটা পণ্যের মত বিবেচনা করে না। শিক্ষকরা এখনও জাতির বিবেক বলে বিবেচিত হয়, অন্যায় কাজের প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে গণ্য হন সমাজের চোখে। তাই শিক্ষকের পদস্খলন ঘটলে সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়, ছাত্ররা অসফল হলে মুখ্য দায়ভার শিক্ষকের ঘাড়ে চেপে বসে—আঘাতপ্রাপ্ত অভিবাবকেরা ক্ষুব্ধস্বরে বলে উঠেন—"স্যারেরা তাহলে কী পড়াচ্ছেন?" কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিচালনাপর্ষদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকে কেউই অঙ্গুলি তোলেন না।

সাধারণ মানুষও বোঝে সত্যিকার শিক্ষায় আলোকিত মানুষ দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে সর্বক্ষেত্রে—রাষ্ট্র পরিচালনায়, প্রশাসনে, দক্ষ ও ন্যায়ানুগ বিচারপদ্ধতি সৃষ্টিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে এবং শিক্ষা-জ্ঞানচর্চা-মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে। সুশিক্ষায় আলোকিত মানুষের অভাবই দেশের বর্তমান দৈন্যদশার কারণ। এদের স্থান দখল করে আছে যে শ্রেণির মানুষ—তাদের সততা, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। যে মানুষটি আজ সংসদে আমার এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হচ্ছেন, তিনি কি জনসাধারণের সত্যিকার প্রতিনিধি; তিনি কি আলোকিত মানুষ, যিনি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন? এমনতর বিভিন্ন প্রশ্ন জনমনে উত্থিত হয়। অথবা যে ব্যক্তিটি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদটি অলংকৃত করে আছেন—তিনি কি শুধুই অলঙ্কার—সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আসীন রয়েছেন সরকারের হুকুম তালিম করার জন্য? তিনি কি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিই শ্রদ্ধাভাজন নমস্য ব্যক্তি—তিনি কি একাডেমিক লিডারশিপ দিয়ে তাঁর সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন? উজ্জ্বল কিছু ব্যতিক্রম

হয়তো আছে, কিন্তু জনগণের ধারণা এর বিপরীতটাই সত্য? রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় এসব ব্যক্তির উত্থান, রাজনৈতিক ভিত্তিটা সরে গেলে এঁরা হারিয়ে যান বিস্মৃতির কৃষ্ণগহ্বরে।

শিক্ষা সমস্যা নিয়ে কথা বলার আগে শিক্ষা নিয়ে বড় বড় মানুষেরা কী ভাবতেন এমন দু-চারজনের কথা শোনা যাক। আলবার্ট আইনস্টাইন বলতেন : "মানুষকে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দান করাই যথেষ্ট নয়। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করলে সেই মানুষ এক ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু সুসঙ্গতভাবে বিকশিত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না।... একজন তরুণের মধ্যে স্বাধীনভাবে বাছবিছার করে চিন্তা করার ক্ষমতা গড়ে তোলাও একটি উত্তম শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।... শিক্ষাদানের পন্থা এমন হওয়া উচিৎ, যাতে যা শেখানো হচ্ছে, সেটিকে তরুণরা কঠোর কাজ হিসেবে নয়, মূল্যবান উপহার হিসেবে গণ্য করতে পারে।"

শুধুমাত্র স্কুলে লভ্য শিক্ষা থেকে পরিপূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয় একথা আইনস্টাইন নানা প্রসঙ্গে বলেছেন: "একজন মানুষকে পরবর্তী জীবনে যেসব জ্ঞান সরাসরি ব্যবহার করতে হয়, স্কুলে সে বিষয়গুলো শেখাতে হবে। অথচ জীবনের চাহিদা এত বহুমুখী যে, স্কুলে সেসব বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব নয়। একজন মানুষকে একটি প্রাণহীন যন্ত্র হিসাবে গণ্য করা আমার কাছে আপত্তিকর মনে হয়। সবসময় স্কুলের এই লক্ষ্য থাকা উচিৎ যে, একজন তরুণ যেন স্কুলজীবন শেষে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নয়, একজন সুসঙ্গত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। বিশেষ জ্ঞান অর্জন নয়, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও নিজের বিচার ক্ষমতা বিকশিত করাকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে।"

শিক্ষা নিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল বিভিন্ন স্থানে নানা কথা বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতার সঙ্কোচন করার পক্ষে তিনি। অর্থাৎ শিশু চাইলেই তাকে যা কিছু করতে দেয়া যায় না। তিনি শিশুর যদৃচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দানের প্রসঙ্গে তাঁর সেই বিখ্যাত গল্পটির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন—"শিশুটি যদি পিন গিলে ফেলতে চায়, তাহলে?" সুতরাং তাঁর মতে, "...শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা যাঁরা বলেন, তারা এর মাধ্যমে এ কথাটি বলতে পারেন না যে, শিশুদের সারা দিন ইচ্ছে মত চলতে দেয়া উচিত। কিছুটা শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। প্রশ্ন হল—কতটুকু শৃঙ্খলা থাকতে হবে এবং কিভাবে তা কার্যকর করা যায়।"

শিক্ষাব্যবস্থার দুটি মুখ্য উপাদান হল—(ক) ছাত্র সম্প্রদায় এবং (খ) শিক্ষকমণ্ডলী। রাসেল স্কুলে শিক্ষকের ভূমিকার ওপর সবচাইতে গুরুত্ব দিতে বলেন: "আধুনিকবিশ্বে স্কুল শিক্ষককে কদাচিৎ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে দেয়া হয়। শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিয়োগ করে, এবং যদি দেখা যায় যে, তিনি প্রকৃত শিক্ষা দিচ্ছেন না, তাহলে তাঁকে 'চাকুরিচ্যুত' করা হয়। শিক্ষার সাথে যতগুলো পক্ষ জড়িত, তাদের মধ্যে শিক্ষক হচ্ছেন সর্বোত্তম। প্রগতির জন্যে মূলত তাঁর সাহায্য আমরা নিতে পারি।"

শিক্ষকদের আদর্শ ভূমিকা কী হওয়া উচিত তার প্রতি কাজী আবদুল ওদুদ বহুপূর্বে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন :— "সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য যেমন নাবিক, সমাজ বা দেশের পক্ষেও তেমনি শিক্ষক। আরোহীরা কত বিচিত্র খেয়াল ও খুশির ভিতর দিয়ে দিন কাটাতে থাকেন, নাবিকেরা সে-সব দেখেন, সময় সময় তাঁদের বুকও আন্দোলিত হয়, তবু জাহাজ চালনা তাঁদের বড় লক্ষ্য, এ-ব্যাপারে ভুল হওয়া মারাত্মক। সমাজ বা দেশের বিচিত্র জীবনযাত্রাও তেমনি শিক্ষকের বুকে স্পন্দন জাগাতে পারে, কিন্তু সর্বাগ্রে তিনি শিক্ষক—মানুষের মনের লালন, শৃঙ্খলা-বিধান, তাঁর বড় কাজ, এবং সেই জন্য তিনি স্বদেশ-প্রেমিক বা বিশেষ-ধর্ম-প্রেমিক ইত্যাদি যাই হোন তারও উপরে তিনি বৈজ্ঞানিক, man of science, বিচার-বুদ্ধি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন—একথা বিস্মৃত হলে মানুষের সেবা আর তাঁর দ্বারা হয় না।"

শিক্ষকদের কাছ থেকে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ থেকে ৭৩ বছর আগে কাজী আবদুল ওদুদ ব্যক্ত করেছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা আজও নিঃশেষ হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হল আমাদের কালের শিক্ষককেরা কি নিজেদের এই ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন?

শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে রাসেলের বক্তব্য হল: "...বাবা-মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী হয়। শ্রমজীবী বাবা-মা চান তাদের সন্তান দ্রুত শিক্ষা শেষ করুক, যাতে তার আয় থেকে সাহায্য পাওয়া যায়।... (অন্যদিকে) উন্নত শিক্ষাপ্রাপ্ত বলে পেশাজীবীরা বেশি আয় করে থাকেন, তাই তাঁরা চান তাঁদের সন্তানরাও এ সুবিধাটি যেন পায়। আমাদের বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সমাজে গড়পরতা বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য উত্তম শিক্ষা চান না। তাঁরা এমন শিক্ষা চান, যেটি অন্য লোকদের প্রাপ্ত শিক্ষার চেয়ে ভালো। শিক্ষার সাধারণ মান নিচু রেখেই এটা করা সম্ভব। আর এ কারণেই আমরা আশা করতে পারি না যে, শ্রমজীবী সন্তানদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে একজন পেশাজীবী আগ্রহী হবেন। একজন পেশাজীবী আপন সন্তানদের জন্য যেসব সুব্যবস্থা বজায় রাখতে চান, যদি সাধারণের জন্য তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাব তীব্র না হয়, তাহলে তিনি সেসব সুব্যবস্থা ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষের সন্তানরাও পাক তা তিনি চাইবেন না।"

এক কথায়, উচ্চকোটির মানুষেরা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছ থেকে, তা নিম্নকোটি ব্রাত্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক তা রাষ্ট্র ও সমাজের অধিকারীরা কোনও মতেই চাইবেন না। আর এ কারণে, অন্যসব ক্ষেত্রের মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনাকাঙ্ক্ষিত বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। বার্ট্রান্ড রাসেলের বক্তব্য পশ্চিমী সমাজকাঠামোকে লক্ষ্য করে দীর্ঘকাল আগে বলা হলেও

আমাদের সমাজের জন্য এখনও এর প্রাসঙ্গিকতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আমাদের রাষ্ট্রচালকেরা ও সুবিধাভোগী সামাজিক পরজীবীরা চান না শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা 'ইতরজনের' কাছে পৌঁছাক। এজন্যই মুক্তবাজার ও বিশ্বায়নের নামে শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, শিক্ষাকে দেখা হচ্ছে বাণিজ্যিক পণ্যের দৃষ্টিতে, এবং শিক্ষাকে দ্রুত বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরের কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে সচেতনভাবেই।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালির জীবন অচল। আমাদের জীবনের হেন দিক নেই, যা তাঁর কলম স্পর্শ করেনি। শিক্ষা নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন নানা প্রসঙ্গে। তাঁর কালের প্রাতিষ্ঠানিক গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সবসময় সোচ্চার ছিল। বিদ্যালয়গুলি তাঁর দৃষ্টিতে 'অচলায়তন', এদেরকে অভিহিত করেছেন 'শিক্ষার কারখানা' নামে। তিনি বলতেন, "ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাতা কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্ক পড়িয়া যায়।" রবীন্দ্রনাথ সেকালে স্কুলের যে চিত্র এঁকেছেন আজকের স্কুলের হাল দেখলে মুখে কুলুপ আটতেন। সেকালে তবু সেটি এক ধরনের কল ছিল, আজ এরা 'বিকল' গোশালায় পরিণত হয়েছে। এখন এসব বিকল গোশালায় বিদ্যা তৈরি হয় না, ভেজাল বিদ্যা বিক্রয় হয় নানা চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। হতভাগ্য অভিভাবকেরা তা বাধ্য হয়ে কেনেন। স্কুল সম্পর্কে এ ধরনের নেগেটিভ রবীন্দ্রচিন্তার পশ্চাতে কারণ হল— রবীন্দ্রনাথের ধারণায় স্কুলগুলো হল 'সমাজবিচ্ছিন্ন'। তাঁর ধারণায়, "...বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জীব।"

রবীন্দ্রনাথের উষ্মা বস্তুত আমাদের দেশে পশ্চিমী সংস্কৃতিতে পুষ্ট স্কুলের আদলে এদেশে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর প্রতি। অন্যদিকে, ইউরোপীয় পরিবেশে এই স্কুল থেকে প্রাপ্ত বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, কারণ স্কুলগুলোর সাথে ছিল সমাজের নিবিড় সম্পৃক্ততা। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে উচ্ছসিত প্রশংসা শোনা যায় ইউরোপীয় স্কুল সম্পর্কে, "য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার যথাকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে—সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে—সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে...।"

আজ যদি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় ও মার্কিনী নামের বাহারি বিশ্ববিদ্যালয়, এ-ও লেভেল আর কিন্ডারগার্টেন নামক পরগাছা বিদ্যায়তনগুলো দেখতেন, নিঃসন্দেহে মূর্ছা যেতেন। তার মতে, "সেসময় ইংরেজরা যেমন নিজেদের প্রয়োজনে কলকারখানা স্থাপন করেছিলেন, তেমনি ইংল্যান্ডের ধাঁচে ইস্কুল স্থাপন করেছিলেন পশ্চিমী দর্শন আর ঐতিহ্য অনুযায়ী—দেশের সংস্কৃতি-দর্শনকে তোয়াক্কা না করে।" রবীন্দ্রনাথের এখানেই ছিল আপত্তি, ভিনদেশের গাছ ভিন্ন পরিবেশে অন্য প্রকৃতিতে বাঁচে না। একথাটিই তিনি প্রকাশ করেছেন, "এজন্যই বলিতেছি য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল ...সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।"

তাই বলে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায়তনকে, যেখানে মূলত গুরুর কাছে বসে তপোবনে বিদ্যালাভ করা যেত, তিনি তখনকার ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে, "ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সে-ও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোন কাজেই লাগিবে না।"

এই দুই বৈপীরত্যের একটি সমন্বয় করে অর্থাৎ পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের ধ্যান-ধারণাকে সম্পৃক্ত করে তিনি চাইতেন এক ধরনের শিক্ষা-দর্শন গড়ে তোলা, যা হবে বিশ্বজনীন। রবীন্দ্রভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন: "অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যলয় গ্রহণ করে।"

আমি আগেই বলেছি প্রকৃতি হল রবীন্দ্রমানসের এক বড়সড় রাজ্য। তিনি মনে করতেন যে বিদ্যালয়ের কথা তিনি ভাবেন তা অবশ্যই গড়ে উঠবে প্রকৃতির কোলে শহর থেকে দূরে কোথাও; তাঁর মতে, "আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।" রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের নামই হল 'শান্তি নিকেতন', যে কথা ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ, "আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল

বৈ আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি নীতিপাঠের কল পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড় ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয় চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র তাহা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।"

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত বই ছাড়া অন্য বই পাঠে নিরুৎসাহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে অতি তিক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, "বর্ণবোধ, শিশুশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক বলি না। পৃথিবীর পুস্তক সাধারণকে পাঠ্যপুস্তক ও অপাঠ্যপুস্তক, প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্সট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণিতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা যায় না।... কমিটি দ্বারা দেশের অনেক ভালো হইতে পারে; ... কিন্তু এ পর্যন্ত এ দেশে সাহিত্য সম্পর্কীয় কোনো কাজে কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যাই নাই।... অতএব কমিটি নির্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্বপ্রকার সাহিত্যরসবর্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহার দোষ দিব। আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া যে সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না; 'সুকুমারমতি' হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।... যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানব-জীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যকশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমান স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না।... শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না।"

আমাদের দেশের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষও এই মানসিকতায় আচ্ছন্ন, ফলে শিশুদের স্কুলব্যাগের বোঝা যেমন আয়তনে ও ওজনে বাড়ছে, মনের বিকাশ সে পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে না, বরং দিনদিন সঙ্কুচিত হচ্ছে। আমরা গত ত্রিশদশকে কতটা সংস্কৃতবান, শিক্ষিত, সভ্য এবং অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভর হতে পেরেছি সে কথা আমি বলতে পারব না, সে বিষয়ে বলতে পারেন আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অর্থবিষয়ক মন্ত্রণালয়। আমাদের দেশের পরিসংখ্যানবিদ্যার জনক কাজী মোতাহার হোসেন বলতেন, "কোন জাতি কতটা সভ্য, তা নির্ণয় করার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাপকাঠি হচ্ছে তার শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য।" আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে দৈন্যদশা পরিস্ফুট তা থেকে আঁচ করা দুঃসাধ্য নয় কাজী মোতাহার হোসেনের মাপকাঠিতে আমরা কতটা সভ্য হয়েছি। মোতাহার হোসেন আরও বলেছেন, "...(জাতির) ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য শিশু, কিশোর... এদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে দিতে হয়। এই শেষোক্ত কাজটি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই সর্বাধিক নির্ভর করে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার এত গুরুত্ব।"

কিন্তু প্রশ্ন হল নীতি-দর্শনহীন ভেঙে পড়া যে শিক্ষা ব্যবস্থার রেশ কাজী সাহেবের বাল্যকালের পর এখনও বিদ্যমান—তা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্তিতে নেগেটিভ ভূমিকা ছাড়া আর কী করতে পারে? সর্বক্ষেত্রেই কি জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি না ? কাজী সাহেব আরও বলতেন, "মায়ের পেট থেকে পড়েই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু এরও আগে পিতামাতার মনোবৃত্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক... ইত্যাদির প্রভাব কিছুটা উত্তরাধিকার-সূত্রে শিশুর উপর বর্তে। এই কারণে বয়স্কদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে।" কিন্তু এ কাজেও আমরা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি—গত ৩-৪ দশক ধরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে রয়েছি। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয়েছে, আত্মসাৎ হয়েছে—ফলে আজ অনেক সাধারণও দাবি তোলেন বয়স্কশিক্ষার নামে এই প্রহসন অচিরেই বন্ধ হোক। আর এই তথাকথিত অক্ষরজ্ঞান দান ঐ ব্যক্তিটির কোনো ভৌত কাজে লাগে না। কাজী সাহেব মনে করতেন, "যে শিক্ষা বর্তমানে চালু আছে তা নিজদেশে আমাদের পরবাসী করে তোলে,... আমরা বিদেশির সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্ক রাখব, কিন্তু তাই বলে নিজের দেশে নিজেরাই বিদেশী বনে যেতে রাজি নই। যে শিক্ষা আমাদের দেশের লোককে ঘৃণা করতে শেখায় বা তাদেরকে শোষণ করার প্রবৃত্তি জোগায়, সে দুষ্ট শিক্ষা থেকে আমাদের শতহস্ত দূরে থাকা দরকার।"

বিজ্ঞ পরিসংখ্যানবিদ বহুকাল আগে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সেই দুষ্ট শিক্ষাই আজ দুষ্টক্ষতের মত দুষ্ট মানুষের মাধ্যমে সমাজের কাঁধে চেপে বসেছে। বর্তমান যুগে শিক্ষার দিক নির্দেশনায় রাষ্ট্র একটি বড় ভূমিকা পালন করে। মধ্যযুগে বা তার আগে শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোনো আগ্রহ দেখায়নি। এছাড়া রয়েছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমাবিশ্বে রেনেসাঁর আগে শিক্ষা বিষয়টি ছিল চার্চের কর্তৃত্বাধীন। ফরাসিবিপ্লব উচ্চতর জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিশেষ করে সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজে প্রবল আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তখন থেকেই ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ড, জার্মান ও ফ্রান্সের মত দেশসমূহে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা-কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, অনেকটা জনগণের মধ্যে ক্যাথোলিক বিশ্বাসকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এছাড়া মনে করা হয়েছিল যে জনগণের মধ্যে শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র চর্চা অসম্ভব, মনে করা হত যে অজ্ঞজন আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য শুধু বোঝাই নয়, দেশের জন্য অপমানকর। এছাড়া পুঁজিবাদী অবকাঠামো নির্মাণে দক্ষ শ্রমিক ও জ্ঞানের শৃঙ্খলায় সুশিক্ষিত এলিট শ্রেণির প্রয়োজন অপরিহার্য। শিক্ষাব্যবস্থার নামে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠায় রাষ্ট্র এটিকে তার প্রয়োজনে নানা কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। বার্ট্রান্ড রাসেল শিক্ষার দিক নিয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "এর মাধ্যমে (শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যবহার করে) তরুণ ও যুবকদের বশে রাখা যায়; এর ফলে আদব-কায়দা ভালোভাবে শেখানো যায়, অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়।... (তাদেরকে) বিদ্যমান রাষ্ট্রচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি

শ্রদ্ধাশীল হতে এবং সকল ক্ষমতার মৌলিক সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে শেখায়। এটি প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থাকতে শেখায় এবং ভিন্নতর মতবাদকে দৃঢ়ভাবে দমন করে থাকে।"

আমাদের মনে রাখতে হবে যে পুঁজিবাদী বা মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্র হল সবচাইতে নিপীড়ণমূলক যন্ত্র। শিক্ষাসহ সকল প্রতিষ্ঠানকে এই নিপীড়ণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে গোষ্ঠী স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে। আমাদের সমাজে রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা কিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ কাজে কিভাবে ব্যবহার করছেন তা দিবালোকের মত স্পষ্ট।

'শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চে'র ঘোষণাপত্রে আমাদের চলমান শিক্ষাব্যবস্থার নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করবেন এর সংখ্যা বেশি হবে না। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার প্রয়োজন নেই, তবুও দু-একটি কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই।

এখানে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাদানের প্রণালী বা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এরমধ্যে আমরা মূল তিনটি ধারা বা স্রোতকে চিহ্নিত করতে পারি :—

১. 'সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা' যা শিক্ষার্থীর শ্রেণি-ধর্ম-জাত-অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে এখনও সকলের জন্য অবারিত। এই ব্যবস্থাটি বলা যেতে পারে ব্রিটিশ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার রেশ হিসেবে চলে আসছে যদিও এর সেক্যুলার চরিত্রকে বিনষ্ট করা হয়েছে নানা সময় নানাভাবে।

২. ইংরেজি মাধ্যমের নামে প্রচলিত 'কিন্ডারগার্টেন' এবং 'ও-এ লেভেল'-স্তরের নানা বিদ্যায়তন। এগুলো গড়ে উঠেছে পশ্চিমমুখী আমাদের সমাজের বিত্তবান শ্রেণির কিছু মানুষের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদানের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। এ স্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের মূখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জন। এই স্কুলসমূহের সাংস্কৃতিক ভিত হল পশ্চিমী, কিন্তু বাংলাদেশের স্যাঁতস্যাতে পরিবেশে কৃত্রিমভাবে স্থাপিত (transplanted)। এই কৃত্রিম স্কুলগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে কী তীক্ষ্ণ মন্তব্য করতেন, পাঠক তা আঁচ করতে পারেন আমাদের পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে।

৩. মধ্যযুগ থেকে চলে আসা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে থেকে প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা'। আধুনিকায়নের নামে এই ব্যবস্থায় ব্রিটিশ আমল থেকেই কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে;—পাঠ্যসূচিতে ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাতেও বর্তমানে বিদ্যমান বিভিন্ন স্রোত। আধুনিকায়নই হোক বা পুরাতন ব্যবস্থাই অব্যাহত থাকুক এই শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলাম ধর্মানুসারী একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত, এবং এর মূল ভিত্তিটা হল কোরান ও সুন্না।

বস্তুত ১৯১৯ সালে গঠিত 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশন', যা সাধারণভাবে 'স্যাডলার কমিশন' নামে পরিচিত, ব্রিটিশ ভারতে বিশেষকরে তৎকালীন বাংলাদেশে (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) পশ্চিমা লিবারেল ডেমোক্রেসির দর্শনকে ভিত্তি করে একটি পরিমার্জিত আধুনিক সেক্যুলার এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করেছিল। কমিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতি ছিল 'সরকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত নিরঙ্কুশ স্বায়ত্বশাসন', যেখানে নীতি-নির্ধারণ ও পরিচালনায় শিক্ষকদের থাকবে সিংহভূমিকা। বর্তমানে ইউনেস্কোর সুপারিশেও সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এমনকি শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় টেক্সটবুক রচনায়, সিলেবাস প্রণয়নে, শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবনে ও শিক্ষা-উপকরণ নির্বাচনে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য নির্দেশ দান করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের সরকার শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয় স্বাধিকারের নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উচ্চতম বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও সরকার তার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। বেসরকারি স্কুলগুলো এখন পরিচালিত হচ্ছে স্থানিক সরকারি দলীয় রাজনৈতিক নেতা ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে, যাদের পেছনে রয়েছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। এমনকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও নানা চাতুরিতে সরকার তার প্রতিভূদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। বহিরাগত রাজনৈতিক মাস্তানদের হাতে শিক্ষালয়গুলো বন্দী। অথচ জ্ঞান সৃষ্টির জন্য, উদ্ভাবনী মেধা বিকাশের জন্য, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চাই 'মুক্তবুদ্ধি চর্চার পরিবেশ' এবং নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, যার নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন। কিন্তু আমাদের সরকারগুলো এ নীতিতে বিশ্বাস করে না, এরা বিশ্বাস করে শিক্ষালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর 'টোটাল কন্ট্রোল' করার নীতিতে।

১৯৭৪ সালে বিশিষ্ট রসায়নবিদ কুদরাত-এ-খুদার নের্তৃত্বে গঠিত শিক্ষাকমিশন যে সুপারিশ করেছিল, তা স্যাডলার কমিশনের ধারাকে আরও বলবান করেছিল আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তীকালের পরিবর্তিত অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে। আমার মতে একটি সেক্যুলার গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা নির্মাণে এই কমিশনের সুপারিশমালা ছিল যুগোপযোগী ও অতিগুরুত্বপূর্ণ। এই কমিশনের সুপারিশকৃত শিক্ষাব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে 'সেক্যুলার লিবারেল ডেমোক্রেসি' ও 'সমাজতান্ত্রিক

ধাঁচের' (যা অনেকটা বিলেতের লেবার পার্টির অবস্থানের কাছাকাছি) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই দর্শনকে ভিত্তি ধরে কমিশন তার প্রতিবেদনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেভাবে চিহ্নিত করেছে তা হল :—

- দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব
- মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ব
- নৈতিক মূল্যবোধ
- সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষা; প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূলে শিক্ষা; ... সৃজনশীলতা ও গবেষণা।

খুদা কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় আমার দৃষ্টিতে প্রধান লেকুনা (lacuna) বা ফাঁক হল, সেক্যুলার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিলেও কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিল, আধুনিকরণের নামে বিজ্ঞানী কুদরাত-এ-খুদা মৌলবাদী সংরক্ষণশীল মহলের সাথে কম্প্রোমাইজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। বামপন্থী কতিপয় ছাত্রসংগঠনও এই কমিশনের প্রতিবেদনে পরিপূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করতে পারেনি। যেমন উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশকে তারা শিক্ষা-সঙ্কোচন বলে উল্লেখ করেছে, তারা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার সুপারিশকে পরস্পর বিরোধী বলে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছে। তাদের বক্তব্য হল আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধার কথা তুলে এবং উচ্চমান অর্জনের অজুহাত তুলে কমিশন প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচনের কথা বলেছে।

কমিশনের মতে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো : '...জ্ঞানদক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন', মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধে সম্যক বিকশিত, কর্মানুরাগী, স্বাধীনচেতা এমন ধরনের সুশিক্ষিত গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যারা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে, এক কথায় জাতির দিকদর্শন হিসেবে কাজ করবে। কারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য: "শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা জাতির অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং সমাজের সকল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে সুনির্বাচন হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সাধারণতঃ প্রার্থীর মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, উৎপাদনশীল বা সমাজকল্যণমূলক কর্ম অভিজ্ঞতা এবং ভর্তি পরীক্ষায় তার ফলাফল ভর্তির যোগ্যতার মাপকাঠি হবে।... যেসব ছাত্র প্রতিভাবান, সক্ষম ও পরিশ্রমী বলে প্রমাণিত হবে তাদের উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হবে। প্রতিভাবান ছাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী শ্রেণির সন্তান যেন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।"

এই ধরনের সুপারিশকে কি উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচন নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় কী-না, জানি না। তবে এটুকু উল্লেখ করা যায় যে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কুদরাত-এ-খুদার কমিশনের রিপোর্টকে একটি পজিটিভ পদক্ষেপ হিসেবে অক্লেশে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর প্রগতিশীল সুপারিশগুলোকে বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ নেবার আগেই আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অপসৃত হয়। তবে খুদা কমিশনের বিরুদ্ধে সবচাইতে বেশি শাণিত আক্রমণ চালিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদিদের পক্ষ থেকে। কারণ এরা লোকায়ত যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়—মৌলবাদী আদর্শে ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এদের আস্থা।

আর এরই ফলশ্রুতিতে প্রণীত হল বি.এন.পি-জামাতি জোট সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষাকমিশনের (২০০৩) প্রতিবেদন, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন বি.এন.পি বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা। এ কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনার কোন সুযোগ নেই কারণ ধর্মের মোড়কে যা চলছে সেই নড়বড়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকেই রক্ষা করার সুপারিশ করেছে। মৌলিক নীতিমালাসমূহ শিরোনামের সূচনা অধ্যায়টির ৮নং বক্তব্যে বলা হচ্ছে: "শিক্ষা কাঠামো: বর্তমানের শিক্ষা কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা বাঞ্ছনীয়।"

কমিশন যে সরকারের তল্পীবাহক হিসেবে কাজ করেছে, তার স্বাক্ষর রেখেছে যখন খালেদা জিয়া সরকার প্রণীত (২০০৩) প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে (একুনে ২২টি!) বিনা অভিক্ষায় আত্মীকরণ করে নিজেদের সুপারিশ হিসেবে প্রতিবেদনে স্থান দেয়। টীকায় বলা হয়েছে: "উপকমিটি এ ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন/সংশোধন/পরিমার্জন প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না" (বাক্যটির গঠনও ভুল)। কমিশন সরাসরি মৌলবাদিদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মীয় ঝোঁক ও দৃকভঙ্গি দেয়ার সুপারিশ করেছে। উদ্দেশ্য হল সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সেক্যুলার চরিত্র বিনষ্ট করে যতদূর পারা যায় ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসাশিক্ষার কাছাকাছি নিয়ে আসা। এভাবেই কমিশন সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মধ্যকার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য দূর করতে চান। এটি পরিষ্কার বোঝা যায় যখন খালেদা জিয়া সরকার প্রণীত প্রাথমিক 'শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'র দ্বিতীয় ধারার প্রথমটিই বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করার সুপারিশ করে : "শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং

আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।” এর পাশাপাশি কুদরাত-এ-খুদার প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে লক্ষ্য করুন : ১. শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন। ২. শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতূহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং অধ্যাবসায়, শ্রম, সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলির সম্যক বিকাশ সাধন। ৩. মাতৃভাষায় লিখন, পঠন ও হিসাবরক্ষণের ক্ষমতা অর্জন, তদুপরি ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে যে সব মৌলিক জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হবে সে সবের কিছুটা পরিচিতি। ৪. পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি। লক্ষ্য করুন ২২টির জায়গায় মাত্র ৪টি (পরিমিতি বোধেরও বোধহয় প্রয়োজন আছে)।

মনিরুজ্জামান মিঞা ধরেই নিয়েছেন, বাংলাদেশ একটি মনোলিথিক ইসলাম ধর্মাবলম্বীর দেশ,—অতএব শিশুদের প্রথমত মুসলমান বানানো ফরজ, তারপর অন্যকিছু। মিঞা কমিশনের প্রথম সুপারিশটি (৩.১, প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য) হুবহু খুদা কমিশনের সুপারিশ থেকে তুলে আনা হয়েছে। মিঞা কমিশনের শিক্ষাদর্শন ও নীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তাই উদ্দেশ্য-লক্ষ্য করণীয়, কি পড়ানো হবে, না-হবে, সবকিছু ৩০টি উপাদানগুলিয়ে এক পাঁচমিশালি পাঁচন তৈরি করে ‘মৌলিক নীতিমালা’ নামে পরিবেশন করা হয়েছে। কমিশনের চিন্তাভাবনা যে এত এলোমেলো হতে পারে, প্রতিবেদনটি হাতে না নিলে বোঝা যেত না।

এই কমিশন একদিকে সাধারণ শিক্ষাকে ইসলামি লেবাস পড়াবার চেষ্টা করেছেন, আর এর পাশাপাশি পশ্চাদমুখী মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে পাকাপোক্তরূপ দেবার জন্য, এবং বাংলাদেশকে ইসলামি উম্মার কাছাকাছি আনবার জন্য ২০০২ সালে বি.এন.পি-জামাত সরকার গঠিত ‘মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি’র সুপারিশসমূহ কোনো বিচার-বিবেচনা-বিশ্লেষণ ছাড়াই মেনে নিয়ে অবাস্তব সব প্রস্তাবনার সুপারিশ করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন মাদ্রাসাবোর্ড কর্তৃক দেয়া ‘ফাজিল’ পাশ ছাত্রকে অন্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছাত্রদের সমতুল্য এবং অনুরূপভাবে ‘কামিল’ পাশ ছাত্রকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার ডিগ্রিধারী হিসেবে গণ্য করার সুপারিশ করা হয়েছে। এবং এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ আর একটি দুষ্টক্ষত সৃষ্টির সুপারিশ করেছে এই কমিশন, যার নাম হবে ‘এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়’। একেই বোধহয় বলা যায়, ‘এক রামে রক্ষা নেই, তাই সুগ্রীব দোসর’। জনাব মনিরুজ্জামান মিঞা আবার মাদ্রাসা শিক্ষায় কোনো গবেষণা হয় না বলে দুঃখ পেয়েছেন, এবং যাতে গবেষণা চালু হয় এর জন্য সুপারিশও করেছেন। কমিশন বোধহয় ভুলে গেছেন ‘মৌলিক গবেষণা ও জ্ঞান সৃষ্টি’ এবং যে কোনো সৃষ্টিশীল কাজের জন্য চাই মুক্ত পরিবেশ মুক্তবুদ্ধি-চর্চার পরিবেশ, মুক্তচিন্তা করার পরিবেশ, অনুসন্ধিৎসু মন বিকাশের পরিবেশ। মাদ্রাসা শিক্ষায় এর বিপরীতটাই সত্য—এখানে অন্ধত্ব আর কুপমণ্ডূকতার পরিবেশ বিরাজ করে। এই পরিবেশে গবেষণা হয় না, মুক্তমনা-মুক্তচিন্তার উদার মানুষ তৈরি হয় না।

আমরা এবার দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচনায় আনতে চাই—ইংরেজি মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলো নিয়ে। আমরা প্রতিষ্ঠাতাদের বাণিজ্যিক মনোভঙ্গির যতই সমালোচনা করি না কেন, ব্যাঙের ছাতার মত এগুলো গজিয়েছে এমনটি বলা ঠিক হবে না। সমাজে এক ধরনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় অনুভূত হয়েছে নইলে এদের রমরমা বাণিজ্য চলছে কেমন করে। এ ধরনের বিদ্যায়তনগুলি আমাদের সমাজের উপরতলার মানুষ ও বিত্তবানদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা প্রদানের দায়ভাগ বহন করছে। এই স্কুলগুলোর ভিত্তিটাই হল পশ্চিমী সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, যার সাথে দেশজ সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্যের খুব একটা সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ অভিভাবকদের বাসনা এসব স্কুল থেকে পাশ করা তাদের সন্তানেরা আমেরিকা বা বিদেশে পাড়ি জমাবে ভাগ্যান্বেষণে—ভাল বিদ্যা লাভের আশায়, ভাল চাকুরীর সন্ধানে। এখানকার উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী ইংরেজি বলায় চৌকস হবে, দেশে বসেই পশ্চিমী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে পুষ্ট হবে। এরা দোতারা কি জানবে না, কিন্তু গিটারে সুরের মুর্ছনা তুলে আমাদের আপ্লুত করবে, শেখ মুজিব কে চিনবে না—কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটনের নাড়িনক্ষত্র জানবে, পাণিপথ কোথায় জানবে না—কিন্তু ওয়াটারলু যুদ্ধ কবে-কোথায় সংঘটিত হয়েছিল বলতে পারে অবলীলায়; ফরিদা পারভিন কোন সঙ্গীত চর্চা করেন বলতে না পারলেও জুন বায়েজের গান গাইতে তাদের অসুবিধা হয় না। এসব ছাত্ররা মেধায়, বুদ্ধিমত্তায়, সপ্রতিভতায় বেশ চৌকস, এবং সমাজের হতে পারত এক ধরনের অ্যাসেট। আমাদের প্রশ্ন হল যারা এসব স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন এবং পরিচালনা করছেন তারা সমাজের কোন সেবাটা করছেন? এসব উৎপাদিত পণ্যরা সমাজের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করছে, কোন উপকারে লাগছে? যে মূল্যবান পণ্য আমরা রপ্তানি করছি এতে গ্রহীতা দেশগুলো লাভবান হচ্ছে, কিন্তু আমরা দরিদ্রতর হচ্ছি এই মেধাবী সন্তান-সন্ততির সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে। দরিদ্র বাংলাদেশের সমাজে এ ধরনের বিদ্যায়তনগুলো পরজীবী হয়ে বেড়ে উঠছে বিত্তবানদের প্রশ্রয়ে। এমন কী মনিরুজ্জামান মিঞার কমিশনও এদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে, “পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশই দেশের বাইরে প্রণীত ও মুদ্রিত। ফলে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন এসব পুস্তকে থাকে না। দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভূগোল সাধারণত এসব বিদ্যালয়ে কম গুরুত্ব পায়।”

আমাদের তৃতীয় আলোচ্য বিষয় তথাকথিত ধর্মভিত্তিক 'মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা'। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক টোল, সংস্কৃত কলেজ ও পালি কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থাও এদেশে ঐতিহ্যগতভাবে চালু আছে, যদিও এই ব্যবস্থা বর্তমানে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে কোনো তাৎপর্য বহন করে না; একারণে মিঞা কমিশনে এদের সম্পর্কে এক লাইনও লেখা হয়নি। যে কোনো ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা সঙ্কীর্ণমনা, অনুদার, একদেশদর্শী, এবং কুপমণ্ডূক ও গোঁড়ামি মনোভঙ্গির মানুষ সৃষ্টি করতে বাধ্য। কারণ রাষ্ট্রের চাইতেও ধর্ম প্রতিষ্ঠান, যেমন চার্চ বা মসজিদ চায় এমন সব একদেশদর্শী মত ও বিশ্বাস শিক্ষার্থীর মনে ও মগজে গেঁথে দিতে, যা শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসু মনের বিকাশকে অবরুদ্ধ করে দেয়; তাকে করে তোলে যুক্তিহীন উপাদানে। এদের কাছে যুক্তি নয়, বিশ্বাসই হল মূল কথা। উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পর্কহীন বলে এ ধরনের শিক্ষিত মানুষেরা সমাজের কোনো কাজে আসে না, এরা পরজীবী হয়ে সমাজের বোঝা হয়ে দেখা দেয়। ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পড়ুয়ারা একটি জলনিরুদ্ধ কোটরে (watertight compartment) বাস করে ফলে, ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের ফলে সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে এদের মিথষ্ক্রিয়া ঘটে না। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে এ ধরনের বিভিন্ন কোটরাবদ্ধ শিক্ষা শিশু ও তরুণদের মধ্যে গোঁড়ামি সৃষ্টি হয় যা নৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তিনি মন্তব্য করেছেন, "ক্যাথলিক স্কুলের ছেলেরা মনে করে প্রোটেস্টান্টরা পাপী, ইংরেজিভাষী একটি দেশের যে কোনো স্কুলের শিশুরা বিশ্বাস করে নাস্তিকেরা শয়তান, ফ্রান্সের শিশুরা মনে করে জার্মানরা দুর্বৃত্ত, আবার জার্মানির শিশুরা মনে করে ফরাসিরা দুর্বৃত্ত।"

আমাদের দেশের মাদ্রাসার ছাত্রদের অথবা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের ক্লাসে শেখে—"ইসলামই হল সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। অন্য ধর্মগুলো নিকৃষ্ট—সত্যের অনুসারী নয়।" এ ধরনের শিক্ষার্থীর কাছে একজন হিন্দু 'কাফের' ও 'পৌত্তলিক'। তাই সে যখন তার সহপাঠীর মধ্যে কোনো হিন্দু শিক্ষার্থীকে আবিষ্কার করে বা একজন মাদ্রাসার তালেব-এলেম রাস্তায় কোনো হিন্দুকে দেখে তখন সে তাকে কৌতূহলি দৃষ্টি নিয়ে দেখে এবং তার সঙ্গ দ্রুত ত্যাগ করে পালাতে চায় বা অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখে। আবার একজন হিন্দু তার মুসলিম সহপাঠীকে অপবিত্র জ্ঞান করে, কেননা সে তার ধর্মের ক্লাসে শিখে এসেছে, 'বেদই হল সকল সত্যের আধার, আর মুসলমান আর খ্রিস্টানরা হল ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্য'। মৌলবি, পাদ্রি আর পুরোহিতরা ধর্ম ও ধর্মশিক্ষাব্যবস্থায় এর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের সাথে সাথে শেখানোর কৌশলটিকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এত সুন্দর করে তুলে ধরেন যে শিক্ষার্থীরা মুক্তভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অভিযোগ রয়েছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মৌলবাদী সন্ত্রাসের কেন্দ্র ও চারণভূমি। এটিই হল ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত রাখার সবচাইতে বড় বিপদ।

মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা সম্পর্কে ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের মূল্যায়ন হলঃ— "ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া... আরবি ভাষা-সাহিত্য,... ইংরেজি ও বাংলাভাষা মাদ্রাসায় শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে ইসলামিশিক্ষার উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা গৌণস্থান অধিকার করে। এ কারণে মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী, কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদানই মাদ্রাসার লক্ষ্য।" (কমিশনের প্রতিবেদন, ১১.২ অনুচ্ছেদ)।

সে সময় বাংলাদেশ 'ইসলামি শিক্ষা সংস্কার সংস্থা' মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন তা হল, "জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সহিত মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরটিকে সমপরিসর ও একীভূত করা এবং পরবর্তী স্তরগুলিকেও সমপরিসর ও যথাসম্ভব সমন্বিত করা এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করা।" খুদা কমিশন এই সুপারিশের সাথে মতৈক্য প্রকাশ করে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিলোপের সুপারিশ না করে লোকায়ত ও মাদ্রাসাভিত্তিক ধর্মীয়শিক্ষা এই দুটি পদ্ধতিকে কাছাকাছি আনার লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষায় কিছু সংস্কারের সুপারিশ করে আশা প্রকাশ করেছেন, "...আমরা আশা করি এরূপ সংস্কারের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।"

মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে বৈষম্য-অনৈক্যর কথা, (বর্তমানে দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রচলিত বিভিন্ন ধারা সমাজে আর্থ-সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অসমতা সৃষ্টি করছে, যা সামাজিক সংহতি বিরোধী।—মৌলিক নীতিসমূহ, নবম অনুচ্ছেদ) এতদসত্ত্বেও এই বৈষম্যাদি লুপ্ত না করে বৈষম্যাদি টিকিয়ে রাখার পক্ষে মন্তব্য করে বিভিন্ন ধারার মধ্যে তথাকথিত সমন্বয় বৃদ্ধি ও নৈকট্য স্থাপনের পক্ষে সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ হল : "...যেহেতু এসব ধারা পরিবর্তন করা বাস্তবসম্মত নয় সেহেতু অন্তত বিভিন্ন ধারার মধ্যে বিস্তৃত অংশ যাতে সমসত্ত্ব বিশিষ্ট হয় সে লক্ষ্যে কারিকুলাম প্রণয়নের প্রচেষ্টা।" অসহায়ের আত্মসমর্পন আর কাকে বলে? এই সমসত্ত্ব বিশিষ্টতা কী তা এই কমিশনের বিদগ্ধ সদস্যরাই ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। কারিক্যুলাম আর পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন সাধন করেই যদি বিভিন্ন ধারার বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য দূর করা যায় তাহলে বিভিন্ন ধারার শিক্ষা নীতি ও লক্ষ্যের কথাগুলোর অস্তিত্ব থাকে কি? নীতিগত পার্থক্য কি এসব শিক্ষাব্যবস্থার জঙ্গি সমর্থকরা 'সমসত্ত্বতা'র বেদীতে বিসর্জন দেবে? সোনার পাথরবাটি হয় না।

‘মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি’র (২০০২) মতে—এই শিক্ষাব্যবস্থার উৎসবিন্দু হল নবুয়ত প্রাপ্তির পর হজরত মোহাম্মদ মক্কা মুকাররামায় প্রতিষ্ঠিত ‘দারুল আরকামে’ যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেছিলেন। এবং বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ‘রসুলুল্লাহ প্রবর্তিত সেই শিক্ষাধারার উত্তরাধিকার।’ বাংলাদেশে এই শিক্ষার লক্ষ্য হল, “...(এ ব্যবস্থার) দুটি বিশেষত্বের একটি হচ্ছে মৌল বা চিরন্তন, আর অন্যটি হচ্ছে পরিবর্তনশীল বা সংস্কার যোগ্য। প্রথমটি কোরান-সুন্না প্রদর্শিত তৌহিদ, রিসালাত, আখিরাতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সর্বক্ষেত্রে তদনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক সকল কার্য আল্লাহকে কেন্দ্র করেই আবর্তন করার সর্বোচ্চ প্রয়াস। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এমন একটি বিধিবদ্ধ চলমান প্রক্রিয়া যার সাহায্যে স্থান-কালভেদে যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিমার্জন।”

বলাবাহুল্য শেষোক্তটি গৌণ, এবং পরিমার্জনা ও সংস্কারও হতে হবে বিধিবদ্ধ এবং অপরিবর্তনীয় প্রথম বিশেষত্বের সাথে পরিপূরক হতে হবে, বিপরীত বা অসংহত হওয়ার প্রশ্ন আসে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসাশিক্ষায় তথাকথিত আধুনিকায়নের চেষ্টা সোনার পাথরবাটি তৈরির মত অপচেষ্টা হবে। ‘মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি’র (২০০২) সুপারিশক্রমে মিঞা কমিশন সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে তথাকথিত বৈষম্য দূরীকরণ ও উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছে, যার সারমর্ম আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে দুটি কমিশনের কোনো সুপারিশের সাথেই একমত নই। সমস্যাটি ‘কারিক্যুলাম বা পাঠ্যসূচিগত’ নয়, অর্থাৎ মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে কতটা গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরেজি ও বাংলা অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেটা নয়, সমস্যাটি দর্শনগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত। বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি সেক্যুলার উদার গণতান্ত্রিক হয়,—এর অর্থনৈতিক কাঠামো যদি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের হয়, তাহলে যে কোনো ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের রাষ্ট্রকাঠামোয় অচল বা মিসফিট। আমাদের সমাজের মূল ভিত্তিটিই হল ‘বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্রময়তা’ (pluralism)। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, এদেশে রয়েছে নানা ধর্ম ও জাত ও সম্প্রদায়ের মানুষ, তাই বাঙালি সমাজের মূলসূত্রটি হল ‘বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য’ (Unity in diversity)। আর আমাদের জীবন দর্শনের এই বিচিত্রতার কথা আমাদের লোককবিদের কণ্ঠে চমৎকারভাবে গীত হয়:

নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পুত।

বৈশ্বিক মানবতাবোধই হল বাঙালি দর্শনের মূলসূত্র, তাই বাঙালি দেখে ‘সর্বজীবে ব্রহ্ম’ এবং ‘নর’কে বলে নারায়ণ। মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত বাংলার কবি তাই দরাজ কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারেন:

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

আমাদের লোকায়ত উদার গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রের এটিই হওয়া উচিত মৌলনীতি, যার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে রাষ্ট্রব্যবস্থা। আমি এ প্রসঙ্গে লোকসাহিত্য গবেষক আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের একটি উক্তির কথা স্মরণ করতে চাই:

“আমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
ওরে ও পরম গুরু সাঁই
তোর পথ দেখতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরসেদে।”

প্রাচীন বাউল কবির মুখে সহজেই এই মনোহারিণী বাণীর উদয় হইয়াছিল।... মানুষে মানুষে ঐক্যের প্রচেষ্টা ছিল তাঁহাদের সাধনা উদারতার এই এক অদ্বিতীয় সংজ্ঞা।... মানুষে মানুষে বিভেদ আছে সত্য। এই বিভেদকে জয় করাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি ঐক্যের বাহন, বিভেদের চামুণ্ডা নয়। আর আমাদের এই বৈশ্বিক মানবতার বাণীই হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষা-দর্শন।

আমি মোটাদাগে শিক্ষা সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলার চেষ্টা করেছি। শিক্ষা, দর্শন ও নীতি নিয়ে সামান্য কয়েকটি কথা বলে প্রবন্ধের সমাপ্তি টানতে চাই। দর্শন হল ‘সত্য ও জ্ঞান—এবং এতে উপনীত হওয়ার পথ’। তাই শিক্ষা-দর্শন হতে পারে—কী পদ্ধতিতে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন সম্ভব। দর্শনের আর একটি সমতুল্য অর্থ হল দৃষ্টিভঙ্গি—জীবন ও জগৎ সম্পর্কে। জীবন বলতে আমি

আমার সকল কর্মকাণ্ড, চিন্তাচেতনা সামগ্রিক অর্থে বুঝি । সুতরাং দর্শন হল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি । আর এই অর্থেই আমি শিক্ষা-দর্শনকে বুঝতে চাই । আমার কাছে শিক্ষা-দর্শনের মূলে থাকবে সমাজবন্দী বা রাষ্ট্রীয় নিয়মে সতত আবদ্ধ ব্যক্তি মানুষের অনন্ত সম্ভাবনাময় সৃষ্টিশীলতাকে সঞ্জীবিত করা, তাকে জাগরিত করা । মানুষের এই সৃষ্টিশীলতা বিজ্ঞানে, শিল্পে, সুকুমার বৃত্তিতে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায়—এক কথায় আমাদের সামগ্রিক সংস্কৃতিকে উচ্চমার্গে নিয়ে যাবে—যা সমাজ ও রাষ্ট্রকে করবে উন্নত আধুনিকতার দৃষ্টিতে, প্রগতিশীলতার দৃষ্টিতে ।

এই দর্শনের ভিত্তিতে, যার মূল সুরটিই হল মানবতার বাণী, প্রণীত হবে শিক্ষানীতি, যা সরকার বদল হলেই পরিবর্তিত হবে না, যাকে অবলম্বন করে গড়তে হবে শিক্ষা কাঠামো-পাঠ্যসূচি-পাঠ্যক্রম-শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি ভিন্ন উপাংশ । এ নিয়েই আমাদের সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা বা সিস্টেম । এই সিস্টেমের প্রতিটি উপাংশের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া—এই সিস্টেমের সাথে বর্হিজগতের অর্থাৎ সমাজের ঘটবে সতত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া । সমাজে সৃষ্ট হবে সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) । এই দৃষ্টিতেই আমি শিক্ষাব্যবস্থাকে দেখতে চাই ।

নাস্তিকতা—মুর্দাবাদ, বিজ্ঞানচেতনা—জিন্দাবাদ

যতীন সরকার

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক'—দুটো শব্দই জাতে তৎসম, অর্থাৎ সোজাসুজি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় গৃহীত। কিন্তু জন্মক্ষণে শব্দদুটো যে তাৎপর্য বহন করতো, কালক্রমে সে তাৎপর্য তারা হারিয়ে ফেলেছে। বলা উচিত : সে তাৎপর্যকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেক শব্দেরই আদি তাৎপর্য নানাভাবে ভুলিয়ে দেয়া হয়ে থাকে, কিংবা পারিপার্শ্বিক নানা পরিস্থিতির প্রভাবে মানুষ আপনা-আপনিই তা ভুলে গিয়ে শব্দের ভেতর নতুন তাৎপর্যের সঞ্চার ঘটায়। এতে যে সব ক্ষেত্রেই ক্ষতি হয়, তেমন বলতে পারি না। 'গবেষণা'র মতো শব্দ তার জন্মক্ষণের 'গরু খোঁজা'র মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অর্থের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে একে সর্ববিধ অনুসন্ধানের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। তেমনটি ঘটেছে 'তৈল' বা 'তেল' শব্দটির বেলাতেও। যাকে শুরুতে কেবল তিলের নির্যাস বোঝাতো, সেটিই এখন সর্ষের তেল-নারকেল তেল থেকে ডিজেল-পেট্রোল পর্যন্ত সম্প্রসারিত। আবার উল্টো দিকে 'মৃগ' শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত বিচারে সকল প্রকার পশুকে বোঝালেও এক সময়ে এর অর্থসংকোচন ঘটে হয়ে গেল কেবল 'হরিণ'। অর্থের প্রসারণ ও সংকোচনের পাশাপাশি অনেক শব্দের অর্থ একেবারে পুরোপুরি পাল্টেও গেছে। যেমন—'সন্দেশ' শব্দটির মূল ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে 'সংবাদ'—সে কথা তো আমরা ভুলেই গিয়েছি। এখন আমাদের কাছে 'সন্দেশ' হয়ে গেছে কেবল মিষ্টদ্রব্য।

এ রকম বহু শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ-সংকোচন-পরিবর্তনের কথা বলা যায়। শব্দের অর্থের বহুমুখী রূপ বদল নিয়ে তো 'সিম্যান্টিক্স্' (Semantics) নামে ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখাই গড়ে উঠেছে। আমার আজকের কথা সিম্যান্টিক্স্ কিংবা ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে নয়,—আস্তিক ও নাস্তিক নিয়ে। তবে এ সম্পর্কে বলতে গিয়েই আমাকে ভাষাবিজ্ঞানের (অন্তত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিষয়ক জ্ঞানের) শরণ নিতে হচ্ছে।

সংস্কৃত ভাষার প্রায় সকল শব্দের মূলে আছে কোনো না কোনো ধাতু বা ক্রিয়ামূল। সেই ক্রিয়ামূলটির অর্থ অঙ্গে ধারণ করেই এর সঙ্গে উপসর্গ বা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তৈরি হয় এক বা একাধিক শব্দ। 'আস্তিক' এবং 'নাস্তিক'-ও এভাবেই তৈরি হয়েছে। দুটো শব্দেরই মূলে আছে 'অস্' ধাতু, যার অর্থ 'থাকা' (to exist)। 'অস্' ধাতু থেকেই হয়েছে 'অস্তি'—অর্থাৎ 'আছে'। 'যা আছে' তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে যে মানুষ, সেই মানুষই হচ্ছে 'আস্তিক'। আর যা আছে তাতে যার বিশ্বাস নেই, সেই 'নাস্তিক'। এ রকম অর্থ সমন্বিত করেই 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' শব্দ দুটো গঠন করা হয়েছিল।

কিন্তু তারপর কী হলো? কর্তৃত্বশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি শব্দ দুটোর আসল অর্থকে চাপা দিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো অর্থে এর প্রয়োগ করতে শুরু করলো। 'যা আছে' সেই বস্তু ও বস্তুর শক্তিতে যার বিশ্বাস, 'বস্তুই বাস্তব'—এ কথা যারা মানে, লৌকিককে ও প্রত্যক্ষেই যাদের আস্থা, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদেরকেই বললো 'নাস্তিক'। এর বিপরীতে অস্তিত্বহীন ও অ-বাস্তব অলৌকিককে তথা অবিশ্বাস্যকেই যারা বিশ্বাস করে, যার অস্তিত্ব কোনো মতে প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ করা যায় না সে রকম কল্পনাসৃষ্ট এক বা একাধিক বিধাতা কিংবা তেত্রিশ কোটি দেবতা বা অপদেবতার প্রতি যাদের নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস—ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক-বাহকদের কাছে তারাই হয়ে গেল 'আস্তিক'। অর্থাৎ যারা প্রকৃতই 'আস্তিক' তাদেরকে 'নাস্তিক' আখ্যা দিয়ে লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার ধূর্ততাই প্রদর্শন করলো ওই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা।

ওদের ধূর্ততা শুধু ওইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এর মতো আরও অনেক শব্দের মূল অর্থকে লোপাট করে দিয়ে ওরা ওদের নিজেদের স্বার্থসাধক অর্থের অধীন করে নেয়। এভাবেই ওরা 'বস্তু' শব্দটিরও অর্থ বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলে। ব্যুৎপত্তিগত বিচারে 'বস্তু' বলতেও 'যার অস্তিত্ব আছে' তাকেই বোঝায়। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যাদের 'নাস্তিক' আখ্যা দেয় তারা তো আসলে বস্তুবাদী। কারণ তারা জানেঃ লৌকিক ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ অস্তিত্বশীল বস্তুই বিশ্বের মূল সত্তা, অতীন্দ্রিয় কোনো কিছুর অস্তিত্বই থাকতে পারে না, তাই তা নিতান্তই 'অবস্তু'। বস্তুবাদীদের এরকম প্রত্যয়ের মোকাবিলায় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা 'বস্তু' শব্দটির অর্থকে উল্টিয়ে দিয়ে অবস্তুকেই বস্তু বলে প্রচার করে, এবং প্রাকৃতজন বা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস প্রবণতায় সুড়সুড়ি দিয়ে বলতে থাকে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'। অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত দেবতা বা ঈশ্বরই হচ্ছে আসল বস্তু, এবং যুক্তিতর্কের বদলে কেবল বিশ্বাসের সাহায্যেই সে বস্তুকে জানা যায়—সাধারণের মনে এরকম প্রতীতিরই শিকড় গেড়ে দেয় তারা। 'বেদান্ত সার' নামক দার্শনিক গ্রন্থে 'বস্তু'র সংজ্ঞা দেয়া হয় এভাবে—'সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মই বস্তু'। অর্থাৎ বস্তুকে বস্তুর বদলে তারা একটা 'হিং টিং ছট'-এ পরিণত করে ফেলে। শুধু ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা দেবতা নয়, অপদেবতা বা ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো-পিশাচ এমন সব অবস্তুর প্রাকৃতজনের বিশ্বাসের গোড়াতেও তারা প্রতিনিয়ত জল সিঞ্চন করে চলে। কিন্তু যারা জ্ঞানের সাধনা করেন, দর্শন চর্চা করেন, তাঁদের তো আর এভাবে সরল বিশ্বাসের বৃত্তে

আটকে রাখা যায় না। তাই দর্শনের আলোচনায় যখন দেখা যায় যে যুক্তিতর্ক দিয়ে অলৌকিক অপ্রাকৃত কোনো দেবতা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনো মতে প্রমাণ করা যায় না, তখন ওরা অন্য পথ ধরে।

বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত—প্রাচীন ভারতের এই ছয়টি দর্শনকেই ব্রাহ্মণরা 'আস্তিক' দর্শনের স্বীকৃতি দেয়। অথচ, এক 'বেদান্ত' ছাড়া অন্য পাঁচটি দর্শনেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলা হয়নি। বেদান্ত দর্শনও কোনো ব্যক্তিক বা ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব (যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মানুষ স্তবস্তুতি পূজা অর্চনা করে) প্রমাণ করতে পারেনি। সে দর্শন বলেছে যে এক নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে বিকশিত হয়েছে, এর বাইরে কোনো ঈশ্বর নেই। 'সাংখ্য' দর্শন তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে যে—"ঈশ্বর নেই, কারণ তা থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না" (ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ)। তবু সাংখ্যদর্শন আস্তিক দর্শন হলো কী করে?

হলো 'গরজ বড় বালাই' বলে। সে সময়কার বস্তুবাদী দার্শনিক লোকায়তিকরা যখন চোখা চোখা যুক্তি দিয়ে দেব-দেবতা-ঈশ্বর তথা সমস্ত প্রকার অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন তখন ওদের সঙ্গে তর্ক করে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী দার্শনিকরা কিছুতেই হালে পানি পাচ্ছিলেন না। আর তা না পেয়েই থাকা না-থাকার বিষয়টি নিয়ে তাঁরা জেদ ধরে থাকলেন না। আসলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নেই, এ নিয়ে কোনো যুগের কোনো দেশের কর্তৃত্বশীল শক্তিরই তেমন কোনো মাথা ব্যাথা থাকে না। তবে জনসাধারণের ভেতর ঈশ্বর তথা অলৌকিকতায় বিশ্বাস থাকলে যে শাসন-শোষণ চালাতে খুব সুবিধা হয়—এ কথা সব দেশের ও সব যুগের কর্তৃত্বশীলরাই বিলক্ষণ অবগত ছিলেন ও আছেন। তাই নিজেরা ঈশ্বরে বা অলৌকিককে বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, নিম্নবর্গের জনসাধারণের ভেতর এসব বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার সবরকম উপায়ই তাঁরা খুঁজে বের করেন। আর উচ্চবর্গের মানুষদের মধ্যে যারা জ্ঞান চর্চার আনন্দে ঈশ্বর বা অলৌকিকতার পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তির খেলা খেলেন, সে-সব খেলায় কর্তৃত্বশীল শাসকগোষ্ঠীর হর্তাকর্তারা সাধারণভাবে কোনো বাধার সৃষ্টি করেন না; তারা কেবল সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের কর্তৃত্বটি নিরঙ্কুশ থাকে কিনা—সেদিকটাতেই নজর রাখেন। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জ্ঞানচর্চার ফলে কর্তৃত্বশীলদের কর্তৃত্ব যখন সামান্য মাত্রায়ও চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে যায়, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে উদারতার মুখোশ খুলে ফেলে, সে-রকম জ্ঞানচর্চাকে 'নাস্তিকতার চর্চা' বা এরকম অন্য কোনো অপবাদ দিয়ে সবলে দমন করে। যে-মতবাদ শাসকদের কর্তৃত্ব তথা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে সেটিই তাদের বিবেচনায় আস্তিকতা, আর যে-মতবাদ এর বিপরীতটি করে সেটিই নাস্তিকতা। কর্তৃত্বশীলগোষ্ঠী সর্বত্র ও সর্বদাই চিন্তায় ও কর্মে এরকম 'প্র্যাগমাটিক'। এরকম প্র্যাগমাটিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেকালের ভারতবর্ষের কর্তৃত্বশীলগোষ্ঠী ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মানুষদেরও আস্তিক ও নাস্তিক এই দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, কিংবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে নানা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করেন, অথবা ঈশ্বর নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান না, তেমন লোকেরাও যদি কর্তৃত্বশীল ব্রাহ্মণ্যবিধানের প্রতি থাকেন অনুগত, সে বিধানের বৈধতাকে মেনে নেন বিনা প্রশ্নে, জন্মগত বর্ণাশ্রম ধর্মে থাকে তাদের অটুট আস্থা, তাহলেই তারা সবাই 'আস্তিক'। এই আস্তিকতায় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারটা আবশ্যিক নয়, আবশ্যিক হলো 'বেদ' এর কর্তৃত্বের ওপর নিরঙ্কুশ আস্থা। বেদের উপর আস্থা মানে ব্রাহ্মণের ওপর আস্থা, ব্রাহ্মণ্যবিধানের ওপর আস্থা। 'বেদ' তো আসলে গ্রন্থবিশেষের নাম নয়। ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রচারিত, ব্রাহ্মণদের দ্বারা কুক্ষিগত, ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকারে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার নাম বেদ। ব্রাহ্মণ-গুরুর মুখ থেকে কানে শুনেই বেদবিদ্যা রপ্ত করতে হতো বলে বেদের আরেক নাম শ্রুতি। সমাজের সকল শ্রেণির লোকের অধিকার ছিল না এই শ্রুতি বা বেদবিদ্যাচর্চার। বিশেষ করে সমাজের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা ছিল শূদ্রবর্ণ বা নিম্নবর্গের অন্তর্গত—অর্থাৎ যারা ছিল 'সবার পিছে সবার নিচে' 'সর্বহারা'র দলে—তাদের কানে কখনও 'শ্রুতি'কে পৌঁছতে দেয়া হতো না। শূদ্ররা যদি কোনোমতে সেই শ্রুতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়তো, এমন কি পরিচিত হওয়ার চেষ্টাও করতো, তাহলেই তাদের ওপর কঠিন শাস্তি নেমে আসতো।

এই শ্রুতির ব্যাখ্যাভাষ্য তথা প্রায়োগিক রূপই হলো 'স্মৃতি'। 'স্মৃতি'রই আরেক নাম 'ধর্মশাস্ত্র'। ধর্মশাস্ত্রের কঠোর বিধানে শূদ্র তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের শ্রমনিষ্ঠ মানুষ ছিল শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত—সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার থেকেই বঞ্চিত। ধর্মশাস্ত্রের বিধানেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা ছিল সর্বপ্রকার সুবিধাভোগী। ওদের ঐ সুবিধাভোগকে নিরঙ্কুশ রাখার লক্ষ্যেই অত্যন্ত কঠোরভাবে ধর্মশাস্ত্রের বিধানগুলো প্রয়োগ করা হতো। ধর্মশাস্ত্রের বিধানকে মেনে চলাই, ব্রাহ্মণদের মতে, বেদকে মান্য করা। এভাবে বেদকে মান্য করেন যে দার্শনিকরা—তাঁরা ঈশ্বরকে না-মানলেও 'আস্তিক'। কারণ ঈশ্বর না-মেনেও তাঁরা তো ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেন না, তাঁরা তো স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। ঈশ্বরকে তাঁরা হাজারবার অমান্য করলেও তাতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের কোনো ক্ষতি হবার নয়। বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করার নামে তাঁরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের 'অথরিটি'কে মানেন, তাই তাঁরা আস্তিক।

কিন্তু বেদ মান্য না-করলে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবিধান না-মানলে) ব্রাহ্মণ্যবাদিদের বিচারে কেউ আস্তিক বলে বিবেচিত হবে না, তারা সবাই নাস্তিক। কারণ, এই বেদ অমান্যকারিরা তো আসলে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বকেই অস্বীকার করেন। যেমন—চার্বাক বা লোকায়তিক নামে পরিচিত দার্শনিকরা। ব্রাহ্মণরা যে বেদের দোহাই দিয়ে নিজেদের তাঁবে রাখতে চাইতো, লোকায়তিকদের মতে সেই বেদ একেবারেই ভুয়া, বেদ কোনো মতেই প্রামাণ্য কিছু নয়, ভণ্ড ও ধূর্ত ব্রাহ্মণরাই লোকঠকানোর জন্য 'বেদ' নাম দিয়ে একটা তথাকথিত বিদ্যার পত্তন করেছে। লোকায়তিক দার্শনিকরা দেহাতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না; তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিনাশ ঘটে যায়, মৃত্যুর পর মানুষের পুনরায় জন্মগ্রহণ করা কিংবা স্বর্গ-নরক ভোগ করা নিতান্ত ই কল্পকথা মাত্র। সমাজে চিরকালের জন্য নিজেদের কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ করে রাখার জন্যই ঔসব কল্পকথা সৃষ্টি করেছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এ-রকম চাঁছাছোলা যাদের কথাবার্তা, ব্রাহ্মণরা যে তাদের 'নাস্তিক' বলে গাল দেবে—সে তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধরা লোকায়তিকদের চেয়ে অনেক নরম কথা বলেও 'নাস্তিক' অপরাধের হাত থেকে মুক্তি পায় না। কারণ, তারাও ছিল 'বেদ'কে প্রামাণ্য বলে মানার—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবিধানকে স্বীকার করে নেয়ার বিরোধী। তাই চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ—এই তিন দর্শনই ব্রাহ্মণ্যবাদী এস্টাব্লিশমেন্টের বিচারে 'নাস্তিক্য দর্শন' এবং এর বিপরীতে অন্য ছ'টি দর্শনই 'আস্তিক দর্শন'।

এভাবেই ব্রাহ্মণ্যবাদ আস্তিক ও নাস্তিক দুটো শব্দেরই অর্থ বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলে। 'যা আছে', ও 'যা দিয়ে' এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট ও পরিচালিত সেই 'বস্তু'র অস্তিত্বে যাদের দৃঢ় আস্থা, সে-রকম প্রকৃত আস্তিককে 'নাস্তিক' বলা তো প্রকৃত সত্যকেই বিকৃত করা। এই বিকৃতিকে আমরা কেন মেনে নেব? আমরা যারা বস্তুবাদী, তাদের বরং জোরগলায় বলা উচিত—"আমরাই হচ্ছি আসল আস্তিক, তোমরা যারা বস্তুর বদলে অবস্তুর প্রতি আস্থা রাখ, 'যা নাই' তাকেই 'আছে' বলে বিশ্বাস কর, যারা নানা রঙের ভাববাদী, এ-রকম সবাই—তোমরা নাস্তিক"। বাস্তবে কিন্তু এমন কথা আমরা বলি না। 'নাস্তিক' কথাটা যে একটা গালি, সে কথাটাই আমরা ভুলে বসে আছি। শুধু তাই নয়। কেউ কেউ তো নিজেদের 'নাস্তিক' পরিচয় দিয়ে মূর্খের মতো বড়াই করতেও পছন্দ করে। আমরা অমুকটা মানি না কিংবা তমুকটা বিশ্বাস করি না—এরকম বুলি কপচিয়েই চলে আমাদের নাস্তিকতার আস্ফালন। কখনও কখনও এরকম আস্ফালনকেই আমরা 'মুক্তবুদ্ধির চর্চা' বলে প্রচার করি।

এরকম করে লাভ কিছুই হয় না, বরং ক্ষতির বোঝাটাই ভারি হতে থাকে কেবল। নাস্তিকতার আস্ফালন করে করে আমরা নিজেরাই আমাদের আসল পরিচয়টা ভুলে যাই, অন্যকেও ভুল বুঝাবার সুযোগ করে দেই। আমরা যাদেরকে সাধারণভাবে বলি 'জনসাধারণ' বা 'লোকসাধারণ', তারা কিন্তু মোটেই নাস্তিক নয়। নাস্তিকতা তো নেতিবাচকতা বা নঞর্থকতারই আরেক নাম। যে জনসাধারণ শ্রমের সূত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থেকে বিদ্যমান বস্তু ও বাস্তবের পরিবর্তন ঘটায়, সমাজরথের চাকাটি সর্বত্র ও সর্বদা সচল রাখে, এবং মানবসংস্কৃতির সৃজন পোষণ ও প্রতিনিয়ত প্রসারণ করে চলে যারা, সেই জনসাধারণ কি নেতিবাচক বা নঞর্থক হতে পারে কখনও? উৎপাদনের বিষয়টাই একান্ত ইতিবাচক বা সদর্থক, এবং ইতিবাচকতা বা সদর্থকতাই আস্তিকতা। তাই উৎপাদন সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ অবশ্যই আস্তিক। আর উৎপাদনের কাজ যেহেতু বস্তু ও বাস্তবকে নিয়েই, তাই তারা বস্তুবাদী ও বাস্ত ববাদী।

কিন্তু জনসাধারণের এই একান্ত স্বাভাবিক আস্তিকতা ও বস্তুবাদ বিকাশ ও বিস্তারের স্বাভাবিক পথ খুঁজে পায় না। পথ রোধ করে দাঁড়ায় তারাই, যারা উৎপাদক নয়, অথচ উৎপাদনের ফলভোগকারী; পরিশ্রম যাদের জীবিকা নয়, পরশ্রমের ফল অপহরণ করে যারা জীবন নির্বাহ করে। এই পরশ্রমজীবী সংখ্যালঘু মানুষগুলো পরিশ্রমজীবী সংখ্যাগুরু জনগণের শ্রমফলই শুধু অপহরণ করে না, তাদের চেতনাকেও নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের স্বাভাবিক আস্তিকতার নির্যাসটিকেও কেড়ে নেয়, পুরোপুরি কেড়ে নিতে না পারলেও একে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করে ফেলে। এভাবেই তারা জনসাধারণের স্বাভাবিক আস্তিকতা ও বস্তুবাদিতাকেও বিকৃত ও বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয়, নানা কায়দায় জনসাধারণের মনে অলৌকিকতা-বিশ্বাস ও অদৃষ্ট-নির্ভরতার সঞ্চার ঘটায়, ধর্মতন্ত্রের আফিমের নেশায় তাদের বুঁদ করে রাখে। সমাজের কর্তৃত্বশীলদের এরকম ধূর্ত ষড়যন্ত্রের ফলে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ ধর্মতন্ত্রকে আশ্রয় করেই বাঁচার পথের সন্ধান করে, ধর্মতন্ত্র-নির্দেশিত এক ঈশ্বর বা একাধিক দেবতার প্রতি আস্থায় ও ভক্তিতে অবনত থাকে, হৃদয়হীন ও আত্মাহীন বাস্তব পরিপার্শ্বে ধর্মতন্ত্রই তাদের জন্য কল্পিত হৃদয় ও কল্পিত আত্মায় বিশ্বাসের জোগান দেয়। এরকম আশ্রয়, আস্থা ও ভক্তির ওপর ভর করেই গড়ে ওঠে বিপুলসংখ্যক জনসাধারণের অভিনব আস্তিকতা। তাদের এই ধর্মতন্ত্র ও আস্তিকতা আপাতদৃষ্টিতে যে রকমই হোক, উচ্চবর্গের কর্তৃত্বশীলদের ধর্মতন্ত্র ও আস্তিকতা থেকে স্বরূপত তা অবশ্যই পৃথক। এরকম আস্তিকতায় অবশ্যই ভুলভ্রান্তি আছে প্রচুর। কিন্তু যেহেতু অভ্রান্ত ও যথার্থ আস্তিক হয়ে ওঠার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, তাই যে ধরনের বিশ্বাস তাদের কাছে আস্তিকতা বলে প্রতিভাত সেটিই হয় তাদের মানসিক আশ্রয়; সেই আশ্রয়টুকু ছাড়তে তারা কোনো মতেই রাজি হতে

পারে না। 'নাস্তিক' বলে যারা আত্মপরিচয় দেয়, কিংবা সমাজে যাদের নাস্তিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, জনসাধারণ তেমন লোককে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা তো করেই না, এদের সম্পর্কে বরং তারা সীমাহীন ভীতি ও অশ্রদ্ধাই পোষণ করে, এদের সঙ্গও তারা পরিহার করে চলে। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্ক ও বস্তুবাদী বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্নতার বিস্তারই ঘটতে থাকে প্রতিনিয়ত।

এরকম একটি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রকৃত আস্তিক বা বস্তুবাদিদের অবশ্যই অনেক বেশি দায়িত্ববান ও ধৈর্যশীল হতে হবে, নাস্তিকতার আস্ফালন দেখিয়ে জনসাধারণকে দূরে ঠেলে দেয়ার বদলে তাদের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। সেরকম আস্থা অর্জনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন লোকসাধারণের বিশ্বাস ও আস্থার প্রকৃতিটিকে সহৃদয়তার সঙ্গে বুঝে নেয়া। তখন দেখা যাবে যে লোকসাধারণ যে ধর্মতন্ত্র মেনে চলে তাকে যতই প্রচলিত শাস্ত্রানুযায়ী বলে মনে হোক না কেন, এর ভেতরে ধিকি ধিকি করে জ্বলছে প্রতিবাদের অগ্নিকুসুম। পুরুত-মোল্লা-যাজকরা ধর্মতন্ত্রের যেরকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, আপাতদৃষ্টে মনে হয় যে লোকসাধারণ বুঝি তাকেই বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। অথচ আসল ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরকম। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে লোকসমাজের স্বাভাবিক বস্তুবাদ তথা লোকায়তিক দার্শনিকদের বস্তুবাদী মতকে ছলে-বলে-কৌশলে অবদমিত করেছিল। দেশের প্রাকৃতজন বা লোকসাধারণ তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়ে দৃশ্যত শাস্ত্রীয় ধর্মতন্ত্রকেই অনুসরণ করে চলছিল। এ-রকমটি শুধু ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মতন্ত্রের বেলাতেই ঘটেনি, বৌদ্ধ কিংবা ইসলাম গ্রহণকারী লোকসাধারণেরও যাত্রা ছিল একই পথ ধরে। এই পথ ধরেই জন্ম নেয় সহজিয়া ও বাউলসহ নানা ধরনের লৌকিক ধর্মতন্ত্র। দেহাত্মবাদই এই সব ধর্মতন্ত্রের অন্তঃসার। 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাই আছে ভাণ্ডে'—লৌকিক ধর্মতন্ত্রগুলোর এই প্রত্যয় তো আসলে একান্ত বস্তুবাদীই। এ-সব ধর্মতন্ত্রের আস্তিকতাও বস্তুবাদী আস্তিকতাই।

অনক্ষর বা প্রায় অনক্ষর বা সাধারণভাবে যাদের 'অশিক্ষিত' বলে বিবেচনা করা হয়, সেই লোকসাধারণের বস্তুবাদী আস্তিকতার স্বরূপটি ভালো করে বুঝে নিলেই একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী' মানুষ দায়িত্ব-সচেতন হয়ে উঠবেন। সাধারণের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্নতা ঘোচাতেও তিনি সচেষ্ট হবেন। তখন তিনি আর নিজেকে 'নাস্তিক' বলবেন না। বরং একজন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী বা প্রকৃত আস্তিক বলে আত্মপরিচয় প্রদান করবেন। লোকসাধারণের বস্তুবাদী চিন্তার মূল মর্মের সঙ্গে তাঁর বস্তুবাদী দর্শনের ঐক্যও যেমন তিনি অনুভব করবেন, তেমনই সে-দর্শনের অসম্পূর্ণতা ও স্থূলতা অপনোদন করতেও তাদের সাহায্যকারী হবেন। নাস্তিকতার আস্ফালনের বদলে প্রকৃত আস্তিকতার প্রত্যয়ে তিনি নিজেও উদ্বুদ্ধ হবেন, অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলবেন।

কিন্তু দুঃখ এই, আমাদের আশেপাশে এ-রকম দায়িত্বশীল বস্তুবাদী আস্তিকদের খুব বেশি সংখ্যায় আমরা দেখতে পাই না। বরং খুব কম সংখ্যায় হলেও দেখা পাই এমন কিছু স্বঘোষিত নাস্তিকের, যাদের বৈদগ্ধ্যের ও অবিশ্বাসের অহংকার আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বিশ্বাস ও স্থির প্রত্যয় নেই, লোকসধারণের ভাব-ভাবনার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ নেই, এবং কোনোরূপ সামাজিক দায়িত্ববোধও নেই। এদের দেখাদেখি যারা নাস্তিকতার ফ্যাশনে আক্রান্ত হন তাঁরা তো আরও ভয়ংকর। এই ভয়ংকরেরাই দায়িত্বহীন কথাবার্তা ও আচরণ দিয়ে ধর্মান্ধ ও মৌলবাদিদের পথ চলাকে সুগম করে দেন। ফ্যাশনদুরস্ত নাস্তিকদের স্থূল যুক্তি ও বাহ্যিক আচরণগুলিকেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মৌলবাদীরা আরও স্থূলভাবে লোকসাধারণের কাছে উপস্থাপন করে, এবং তার ফলে লোকসাধারণ ধর্মধ্বজিদেরই মিত্র বলে গ্রহণ করে বিজ্ঞানসম্মত ধ্যানধারণার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখে।

এরকম অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে বিজ্ঞানচেতন ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী মানুষদেরই। সেটাকেই বড় দেখতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে। আমি কী মানি—সেটাকে বড় করে তুলে ধরতে হবে, কী মানি না তা নিয়ে হাওয়ায় বন্দুক ঘোরানোর কোনো অর্থ নেই। 'মানি-না'র নাস্তিকতা তো অন্ধকার, সেই অন্ধকারের তো শেষ নেই। 'বস্তুকে মানি' বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বস্তু দিয়ে তৈরি, বস্তুর নিয়মেই চলে বিশ্ব, বস্তুই বিধাতা'—এই হচ্ছে বিজ্ঞানচেতনা আর এই বিজ্ঞানচেতনাই আস্তিকতা।

আমাদের প্রাকৃতজন যে-সব লৌকিক ধর্মতন্ত্রের অনুসরণ করে থাকে, তার সবগুলোতেই এই প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞানচেতনা ও বস্তুবাদী আস্তিকতা বিদ্যমান। এরকম বিজ্ঞানচেতনা ও বস্তুবাদ তারা প্রাচীনকালের লোকায়ত দর্শনের উত্তরাধিকার রূপেই লাভ করেছে। কিন্তু সমাজের কর্তৃত্বশীলশক্তির প্রতিকূলতা ও দমন পীড়নের দরুন লোকসাধারণ লোকায়ত দর্শনের উত্তরাধিকারকে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে পরিণত করে নিতে পারেনি, বরং পূর্বতন লোকায়তিক বস্তুবাদের মধ্যেও ভাববাদের ভেজাল মিশিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। যাঁরা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী, তাদের উচিত নাস্তিকতার বড়ফট্টাই না-দেখিয়ে লৌকিক ধর্মতন্ত্র-অনুসারী ওই

সব লোকসাধারণের বিশ্বাস ও আচরণের প্রতি যথার্থ দরদ ও সহানুভূতি ব্যক্ত করা, দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গেই তাদের সঙ্গে মিশে তাদের লোকায়ত বস্তুবাদকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে উন্নীত করা।

আসলে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী যিনি, তিনি তো কেবল আপনাকে নিয়ে, আপনি মত্ত হয়ে থাকতে পারেন না, কিংবা পারেন না নাস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে। তাঁকে একান্তভাবেই আস্তিক বা আস্তিকতার সদর্থকতার সাধনায় নামতে হয়। সে সাধনায় সিদ্ধি লাভও একা একা করা যায় না, জোট বাঁধতে হয় আস্তিক লোকসাধারণের সঙ্গে, সেই জোট বেঁধেই পরিপার্শ্বের সব নাস্তিকে অস্তিতে পরিণত করার প্রয়াসে প্রবৃত্ত হতে হয়—অর্থাৎ বিরূপ ও অধীন বিশ্বকে বদলে ফেলার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হয়। এমন বিজ্ঞান সচেতন মানুষ কী করে নিজের বা তার প্রিয় মানুষদের জন্য 'নাস্তিক' আখ্যাটিকে মেনে নেবে? তার রণধ্বনি হবে, 'নাস্তিকতা—মুর্দাবাদ, বিজ্ঞানচেতনা—জিন্দাবাদ'।

সমাজবাদীর জন্য জরুরি ‘ভাষা’: একটি আত্মোপলব্ধি
বেনজীন খান

বলতে পারেন, আমি ভাষার ভিখারি। আশিটা বছর হল ভাষা খুঁজে ফিরছি। কারণ, গত শতবছর ধরে আমি নীতিবিক্রেতা ছিলাম। কিন্তু কেউই কেনেনি সেই নীতি। বুঝেছি—নীতি ছিল, লেবেল ছিল না, ছিল না বিজ্ঞাপন, না ভাষা। জানি, আমার পণ্য ছিল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। হাইব্রিড, জিএমও না। মাকাল ফলতো নয়-ই। তবুও মানুষ তা নেয়নি। অথচ মাকাল বিক্রেতা পাড়ি দিয়ে গেছে আমাদের সবাইকে। জেনেছি, এই ভাষার বাহনই মাকালওয়ালাকে করেছে বুজুর্গ আর আমাকে কাফের। আমি তাই ভাষার ভিখারি। আশিটা বছর হল আমি ভাষা খুঁজে ফিরছি।

বুঝেছি, বন্দর আর শহরের দরজায় জাহাজ ভিড়িয়ে লাভ নেই। কেননা ওদের আর দেওয়ার নেই। অতঃপর ওরা যাকে মজা-পুকুর, ডোবা অথবা বিল বলে জানে, সেখানে ভাসিয়েছি ভেলা...

অবশেষে নোঙর করলাম নিমাই-আকাশে, আউলচাঁদে, লালনালয়ে। হাত পাতলাম হাছনে, কানাই, জহুরে। অতঃপর থলিতে জমলো মুক্তা, যেন তা হয়ে উঠল মুক্তার সাগর। বুঝলাম, ‘না’ দিয়ে না’কে নয় বরং ‘হ্যাঁ’ দিয়ে ‘না’কে সরাতে হবে।

তফসিরটি এই—
আমার অন্তর-আত্মা বলল, আমাকে একজন মোল্লা অথবা পুরোহিত দেখাও যিনি বিশ্বাসী। আল্লা-ভগবান, দোজক-নরকে বিশ্বাসী। পাবে না। পাওয়া দুরূহ। অতঃপর চারপাশে আছে যারা ভুরিভুরি ...মনায়, ...রশি, ...বাদি, ...বাগি তারা কি সত্যিই বিশ্বাসী? যদি তাই-ই হবে তাহলে কীভাবে সুদ ওরফে লভ্যাংশ এবং ঘুষ খেয়ে মুনাফেকি করে! কিভাবে অন্যের মেহনতের উপার্জন আপন পকেটস্থ করে! আল্লার জমিনে ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে, যা করেননি স্বয়ং নবি মোহাম্মদ। কেউ কি দেখাতে পারবে রসুল মোহাম্মদ কত সম্পত্তির মালিক ছিলেন? অথচ এইসব মুনাফেকরাই আজ প্রতিষ্ঠিত ‘বিশ্বাসী’, ‘ধার্মিক’ হিসাবে!

অন্যদিকে সমাজবাদীদের মেহনতটাই হল: যেন আল্লার জমিনে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আল্লার জমিন আল্লাকে ফিরিয়ে দিতে, অতঃপর এরাই চিহ্নিত হল ‘অধার্মিক’ বলে। কেন?

তফসিরের তরজমা হলো—
ভাষা। ভাষা রপ্ত হয়নি আমাদের, যেমন আত্মস্থ করেছে অন্যরা। আমরা কখনোই দেখিনি এই মাটিতে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ইতিহাসের রঙ আর তার গন্ধ। যেমন তাকাইনি বেদ’র বিরুদ্ধে বুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে কবির-দাদূ, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপরীতে চৈতন্যে, মানুষ-আল্লার সত্য প্রতিষ্ঠায় লালনে।

অতঃপর বিরামহীন কসরতের মধ্যেই মনে পড়ল ১৮৫৫ তে সংগঠিত সিদু-কানু-চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। স্বপ্নে দেবীর নির্দেশ ও সমগ্র সাঁওতালদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা। মনে পড়ল স্বদেশী আন্দোলনের নেতা সূর্য সেনকে দেবী কালী’র মাথা ছুঁয়ে শপথ পাঠের কথা। মনে পড়ল তিতুমীর ও ফকির মজনু শাহদের মেদিনীকাঁপানো ইতিহাস। বুঝলাম, এই মাটিতে সমাজতন্ত্রীরা বড়জোর পণ্ডিতীপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে কিন্তু ধরতে পারেনি ভারতের মর্মগত সত্য। বরং কখনো কখনো তারা ভুলই বুঝেছে। হয়তোবা এই মর্মগত সত্যের সন্ধান পেয়েছিল বাংলার আউল-বাউল আর মধ্যযুগের সন্ত-সাধকরা। তারা বলল না—‘আল্লা-ভগবান-খোদা নেই’। বলল ‘আছে’। আল্লাকে তারা সাত আসমান থেকে আসন দিল মানুষের দেহভাণ্ডে।

সাধক একলিমুর রাজা বললেন—
মন আমার মদিনারে কাশী বারানশি
মনের মাঝে মনের ঠাকুর (তবু) সদায় পরবাসিরে
...
মনেতে মথুরা আছে মক্কা-কাবার ঘর
তার মাঝে বিরাজিছে ঠাকুরও সুন্দর রে।
...
ভাবিয়া একলিম রাজা বলে মক্কায় যাওয়া মিছে

মনের মাঝে খোঁজ ঠাকুর (সে) তোমায় খুঁজিছে রে।

বলেছেন, মক্কা-মদিনা মিছে; মিছে যাওয়া মথুরা-গয়া-কাশি। আল্লা থাকে কাবা'য়-মন্দিরে। কাবা-মন্দির আছে দিলে, মানুষের মনে, মন—মন্দিরে, দিল—কাবাতে। এই যে, 'কাবা' এবং 'খোদা' দুইটি পৃথক সত্তা; এই দুই'র মাঝেও যেন বিস্তর দূরত্ব রয়েছে, যা সাধক জালাল মানতে নারাজ, অতৃপ্ত।

সাধককবি জালাল উদ্দীন খাঁ গাইলেন—

মানুষ থুইয়া খোদা ভজ, এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে
মানুষ ভজ কোরান খোঁজ, পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে॥
খোদার নাহি ছায়া-কায়া স্বরূপে ধরেছে মায়া
রূপে মিশে রূপের ছায়া, ফুল কলি ছয় প্রেমের গাছে॥
আরব দেশে মক্কার ঘর, মদিনায় রাছুলের কবর
বায়তুল্লায় শূন্যের পাথর, মানুষে সব করিয়াছে॥
মানুষে করিছে কর্ম, কত পাপ কত ধর্ম
বুঝিতে সেই নিগূঢ় মর্ম, মন-মহাজন মধ্যে আছে॥

অর্থাৎ মানুষ বাদ দিয়ে খোদা নেই, মানুষ তো খোদারই প্রকাশিত রূপ। খোদা কি বস্তুকে আশ্রয় ছাড়া প্রকাশিত হতে পারে? আহা কী মধুর এ বির্তক। অথচ রসহীন তর্ক করেছে বস্তুবাদীরা। বছরের পর বছর ব্যয় করেছে 'বস্তু' আগে না 'ভাব' আগে? তা নিয়ে। তারা ভাবকে অস্বীকারই করেছে। প্রকারান্তরে অবাস্তবতাতেই আশ্রয় নিয়েছে। অন্যদিকে সাধকরা বির্তকের সমাধান টেনেছেন এইভাবে—ভাব হল বস্তুর গুণ। গুণেরই সমূহ বস্তু। সুতরাং 'ভাব' ও 'বস্তু' অবিচ্ছেদ্য; যাহা ভাব তাহাই বস্তু।

এঙ্গেলসীয় সংজ্ঞা হল—'শক্তির সমূহই বস্তু।' বস্তু থেকে শক্তিকে পৃথক ভাবলে বস্তু অস্তিত্বহীন। একইসাথে বস্তুরূপে ছাড়া শক্তিও প্রকাশহীন। এই যে ছিন্নহীন দেখতে পারা, এটাইতো তাদের মাহাত্ম্য। সাধক বিপ্লব করেছে রাধা ও কৃষ্ণকে অবিচ্ছিন্ন দেখে। যখন রাধা-কৃষ্ণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল মামি ও ভাগ্নের সম্পর্ক। আর মানুষ তাদের মিলনকে ভেবেছিলো 'লীলা', দুর্মূর্খরা বলতো, 'ফষ্টিনষ্টি'; ঠিক তখনই সুফি সাধক বললেন—'দেহ-ই শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ তার আত্মা।' অর্থাৎ যিনি রাধা তিনিই কৃষ্ণ। শুধু তাই-ই না, বরং যিনি নারী তিনিই পুরুষ। এক ও অভিন্ন সত্তা। অর্থাৎ মানুষ একই সাথে নারী ও পুরুষ। কেননা আদমেরই অঙ্গ থেকে তো হাওয়া। নাভী নেই আদমের। যেমন ছিলো না অ্যামিবা'র। এক অ্যামিবা থেকেই তো অপর অ্যামিবা। এখানে কেবা জনক কেইবা গর্ভধারিনী! সুতরাং গৌরাঙ্গ যদি বলেন—'আমি একই সাথে রাধা ও কৃষ্ণের যুগল মূর্তি'। তাহলে তা এক ভয়ঙ্কর বাণী। মিথের আজাজিল এই অবিচ্ছিন্ন দেখতে ভুল করেই তো ইবলিস হয়েছিলো।

লালন সাঁঈ তাই ব্যাখ্যা দিলেন—

আপন ছুরাতে আদম গঠনের দয়াময়
নইলে কি আর ফেরেস্তারে
সেজদা দিতে কয়॥
আল্লা আদম না হইলে
পাপ হইত সেজদা দিলে
শেরেক পাপ যারে বলে
এ দীন দুনিয়ায়॥
দুষে সেই আদম সফি
আজাজীল হল পাপী
তেমনি দেখা যায়॥
আদমি সে চেনে আদম
পশু কি তার জানে মরম
লালন কয় আদ্য ধরম
আদম চিনলে হয়॥

এই যে আদম এবং দয়াময়কে এক করে দেখতে পারা, এর থেকে বড় বিপ্লব আর কী হতে পারে? বিপ্লব শুধু গানে আর কথায় করেনি। করেছে সমাজে, ব্যক্তিগত জীবনাচারে। এই হাজারো জাত-পাতে বিভক্ত সমাজে তারা এক জাতে পরিণত হয়েছে। প্রচলিত আর শাসক মূল্যবোধের বিপরীতে দাঁড় করেছে প্রেম ও ভক্তি।

পিতার নাম গোবিন্দ, ছেলে ইসমাইল। মেয়ে স্কুলে গীতা পড়ে, ছেলে কোরান। এও কি সম্ভব? অথচ ভগবেনে সম্প্রদায়ে এটিই নিয়ম।

মুখ থুবড়ে পড়ি যখন 'বাঙালি ধর্ম'-এ দেখি, ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ হয়েছে যৌথ উৎপাদন ও বন্টন চালু রয়েছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে তারা সামাজিক মালিকানা।

ইতিহাস তো এও সাক্ষ্য দেয়, মধ্যযুগের সন্ত-সাধক দাদূ'র আস্তানায় পাঠ নিয়েই জিল্লেএলাহি আকবর বাদশাহ দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন 'দ্বীন-ই-এলাহি'। সতীমার বাড়ি আউলচাঁদের দোল মেলায় বসে রাজা রামমোহন রায় খুঁজে পেয়েছিলেন 'ব্রাহ্ম ধর্ম'র ধারণা। কর্তাভজা দুলাল চাঁদের জন্য প্রেরিত চিঠি বরাতেই বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন চিকাগো-সম্মেলনে। আর ছেঁউড়িয়ায় লালনালয়ে গিয়ে কবিগুরু হয়েছিলেন ঋষি বরীন্দ্রনাথ। এ থেকে বোঝা যায় ভারতের তথা বাংলার ভাব আন্দোলন কতটা শক্তিধর।

বিশ্ব ভারতী স্থাপনার অনেক পরে একদিন কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন—
'যখন নমঃশূদ্র, সুতার, জেলে, মুচি, ভুঁইমালি প্রভৃতি কুলে উৎপন্ন বাউলদের কথা ও রচনা দেখি তখন আমাদের মনে হয় এমন সব কথা বলিতে পারিলে আমরাও ধন্য হইতাম। ইহাই খাঁটি, শাশ্বত ও সার্বভৌম গণসাহিত্য। আধুনিক এদেশি কৃত্রিম গণসাহিত্যগুলি তো বিদেশের উচ্ছিষ্ট ও অধম অনুকরণমাত্র। আমাদের দেশে এসব প্রকৃত ভক্তদের বাণী সংগ্রহ করিতে হইবে।'...
'আমাদের দেশে সাধু-সন্নাসীদের মাঠে ও সম্প্রদায়ে একটা গঠনরীতি ও বিধি (Constitution) আছে। তাহা ভালো করিয়া আলোচনা করিলে বিলাতি গণবাদ হইতে ভালো অনেক রকম পথ আমরা পাইতাম।...
তিনি আরো বলেন—
'ভারতের গ্রাম গ্রামে যে পঞ্চায়েতী প্রথা, তাহার একটা আগাগোড়া রূপ পাইলে ভারতের সত্যকার গণ-রাষ্ট্রনীতির পরিচয় পাওয়া যাইতো...।'

আমরা সে রূপ খুঁজে পাইনি; আমরা তালাশ করে দেখিনি। কেননা আমরা জীবনানন্দ জানিনি। যখন তিনি বলেন—'বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর...।'

ভাবতে হবে রাজধানীতে ধর্না না দিয়েও ভাসানী কেন সন্তোষে বসে ডাক দিলেই তা রাষ্ট্রীয় ডাকে পরিণত হতো? ভাসানী জানতেন মার্কস-লেনিনের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে এদেশে মশিউল ইসলাম, আবুজর আল গিফারীর অর্থনীতির ডাক দিলেই যথেষ্ট। ব্যক্তি মালিকানা বিলোপ অথবা রাষ্ট্রীয় পুঁজি প্রতিষ্ঠার কথা না বলে মোহাম্মদীয় ভূমিব্যবস্থা বা বাইতুলমালের অর্থনীতির কথা বললেই কেল্লা ফতে। এ সমস্তই ছিল ভাসানীর ভাষা। তা ছিলো জন'র ভাষা; জনভাষা। তিনি ধারণা করেছিলেন জনের টেম্পারমেন্ট। কিন্তু ভাসানীর ভাষা ও ক্ষমতা আত্মস্থ করতে পারেনি তাঁর চোখের মণি'রা। ভাব আর বস্তুর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ক্লান্ত ইতরবস্তুবাদী বিপ্লবীরা গতিময় ভাসানীকে হজম করতে পারেনি। আমাদের জন্য এখন জরুরি তাই মানুষের 'ভাব' ও 'ভাষা' বোঝা।

ভাষা না বুঝলে, করণীয় না জানলে সময় বয়ে যাবে, বিপ্লব হবে না। বিপ্লবের ইঙ্গিত অন্যখানে। কৃষক, লাঙ্গল, গরু, বীজ উপস্থিত থাকলেই ফসল ফলানো যায় না, যদি জমিতে 'জো' না আসে। আবার জো আসলেই ফসল ফলানো যায় না, যদি কৃষকের সংঘশক্তি প্রস্তুত না থাকে। আর যথাসময়ে ক্ষেতে উপস্থিত না হলে ওই জো'র অপমৃত্যু ঘটে। কাদাময়তা হারিয়ে তা কংকরে-ঝিলে পরিণত হয়। ফিরে যায় তার আদিম অবস্থায়, মৃত্যু ঘটে ক্ষেতের জীবনীশক্তির। সমাজেও তেমনি সংঘশক্তি প্রস্তুত না থাকলে বিপ্লবী পরিস্থিতিতেও বিপ্লব হয় না। আর এই সময়ের কাজ যথাসময়ে না করলে পরিস্থিতির অকাল মৃত্যু ঘটে। সমাজ দেহ পচে একেবারে আদিম অবস্থায় ফিরে যায়। তখন সে (সমাজ) ভিতর বাইরের আর কেনো আঘাতই প্রতিহত করতে পারে না। এক বিভীষিকাময় সময় বইতে থাকে। হয়তোবা সেই সময়-ই এখন আমরা অতিবাহিত করছি। আরো কতকাল প্রতীক্ষা করতে হবে জানি না।

সহায়ক সূত্র:

১। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চতুর্থ সংস্করণ-১৯৮৯, কলকাতা।
২। ব্রাত্যজন (সংকলিত), হাছন নন্দন একলিম রাজায় বলে..., ২০০৫ কুমিল্লা।

৩। ভি, পদোস্তেনিক এবং ও. ইয়াখোত, শরীফ হারুন (অনূদিত), দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পরিচিতি, ১৯৮৫ ঢাকা।
৪। ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ্) সম্পাদিত, লালন-সঙ্গীত, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০০, কুষ্টিয়া।
৫। সত্যশিব পাল দেবমহান্ত, ঘোষপাড়ার সতীমা ও কর্ত্তাভজা ধর্ম, ১৯৯০, কলকাতা।
৬। ক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ, ১৯৯৭, কলকাতা।
৭। খন্দকার আবদুর রহিম, শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী, ১৯৯৩, টাংগাইল।
৮। ড. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব, বৈশাখ-১৩৫৯, কলিকাতা।

"যুক্তিবাদ কোনো অনড় দর্শন নয়। যুক্তিবাদ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টায়। শিখতে শিখতে পাল্টায়, পাল্টাতে পাল্টাতে শেখে..."—প্রবীর ঘোষ

প্রবীর ঘোষ—একটি নাম, একটি আন্দোলন; এক জীবন্ত কিংবদন্তি। 'সমকালীন যুক্তিবাদ' দর্শনের স্রষ্টা এবং উপমহাদেশে যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁর নেতৃত্বেই 'যুক্তিবাদী-চিন্তা' আজ ব্যক্তির গণ্ডি অতিক্রম করে সংগঠিত আন্দোলনে রূপ নিয়েছে; আন্দোলিত হয়েছেন-যুক্তিমনস্কতার দিকে এগিয়ে গেছেন এপার বাংলা-ওপার বাংলার লক্ষ-লক্ষ মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাট্যক্লাব, বিজ্ঞানক্লাবসহ বহু সংগঠন। প্রবীর ঘোষের যুক্তিবাদী-দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, অলৌকিকতার কারিগরদের (জ্যোতিষী, পির-ফকির-বাবাজি-মাতাজি, ঈশ্বরের অবতার দাবিদার) বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াই, সাম্যের সমাজ সৃষ্টির আন্দোলনে জনগণকে শামিল করার দক্ষতা, পাণ্ডিত্য ও মনীষাপূর্ণ সহজবোধ্য ভাষার বলিষ্ঠ লেখনী, চ্যালেঞ্জ, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও নিরবিচ্ছন্ন জয়—এসবই তাঁকে করেছে 'হি-ম্যান' এবং যুক্তিবাদীদের করেছে আরও আত্মবিশ্বাসী, নিবেদিতপ্রাণ, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের পথিক। কবি নবনীতা দেব সেনের ভাষায়—"প্রবীর ভূতের পুলিশ"। এ ভূত আমাদের ছোটবেলার ছেলেভুলানো গল্পের জিন-পরী-দৈত্য-দানো নয়। এ ভূত হচ্ছে—মানসিক রোগী কিংবা জনগণকে যারা ঈশ্বর-অদৃষ্টবাদ-অতিপ্রাকৃত শক্তির ধুয়া তুলে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়, ধর্মের নাম করে, পারলৌকিক মুলো দেখিয়ে অসাম্যের জগদ্দল ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখত চায়;—প্রবীর হচ্ছেন তাঁদের পুলিশ। অন্যায্য-অসাম্য-শ্রেণিবিভক্ত সমাজকাঠামো ভেঙে জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক-যুক্তিবাদী-সাম্যবাদী করে গড়ে তুলতে ভণ্ডদের বুজরুকি জনগণের সামনে ফাঁস করার কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রবীর ঘোষ ও তাঁর যুক্তিবাদী সমিতি সেই ১৯৮৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত জ্যোতিষী, দুইশত পঞ্চাশ জন আধ্যাত্মিক নেতা, গুরু, ঈশ্বরের অবতার দাবিদার, বাবাজি-মাতাজির 'অলৌকিকতা' ধরেছেন, বে-আব্রু করেছেন তাঁদের বুজরুকি। শুধু তাই নয়, 'ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি' অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের বিরুদ্ধে ২.৩ মিলিয়ন ভারতীয় রুপির প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে—"কেউ যদি প্রবীর ঘোষের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লৌকিক কৌশল ব্যতীত অলৌকিক ক্ষমতার কোনো প্রমাণ দিতে পারে, তবে তাকে অবশ্যই ২.৩ মিলিয়ন ভারতীয় অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে এবং সাথে সাথে ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে ফেলা হবে।" দুঃখের কথা, এ পর্যন্ত কোনো বাবাজি-মাতাজিই প্রবীর ঘোষের সামনে নিজের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারেননি, বরং অনেকেই ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছেন!

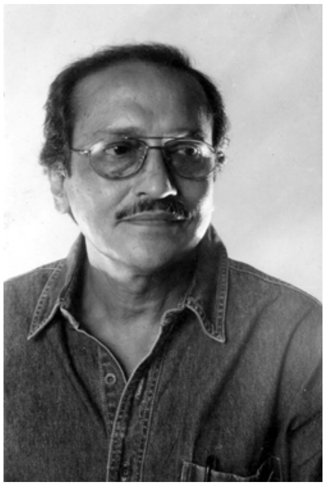

প্রবীর ঘোষের জন্ম, শৈশব, কৈশোর কেটেছে রেলওয়ে শহর খড়গপুরে। পিতা-মাতা আর আট-দশজন হিন্দুদের মত গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বাসায় নিয়মিত পূজা-অর্চনা, ঈশ্বর আরাধনা সবই হত। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ধর্ম, ঈশ্বর, আধ্যাত্মিক গুরুর প্রতি ছিল তাঁর ব্যাপক আগ্রহ আর আর্কষণ। তাই খড়গপুড়ে যেসকল বাবাজি-মাতাজি আসতেন তাঁদের চারপাশেই থাকতেন, লক্ষ্য করতেন এঁদের আচরণ, কথাবার্তা। ফলে খুব অল্প বয়সেই বাবাজি-মাতাজিদের লোকঠকানো কৌশল-জাদু শিখে ফেললেন। আর সেগুলো দিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নানা চমক দেখাতেন প্রায়ই। স্কুলশিক্ষক শুভেন্দু রায়ের অনুপ্রেরণা-উৎসাহে তাঁর মধ্যে তৈরি হয় সমাজবিজ্ঞান-রাজনীতি-ইতিহাস-দর্শন-মনস্তত্ত্ব-নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ আর জ্ঞান অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

প্রবীর কলেজ জীবন থেকেই লেখালেখি করে চলছেন বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও দৈনিক পত্র-পত্রিকায় এবং এই ৬৪ বয়সে এসেও তা চলছে পুরোদমে। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বই 'অলৌকিক নয় লৌকিক' (পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত) আত্মপ্রকাশের পর থেকেই প্রবীর ঘোষ বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের পরিসরে স্বতন্ত্র অবস্থান করে নিয়েছেন। বেনিয়া-তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীরা যখন শাসকগোষ্ঠীর 'পঞ্চম বাহিনী'র দায়িত্ব পালনে রত তখন প্রবীর লেখেন অত্যন্ত নির্মোহ-নিরপেক্ষ এবং সাবলীল ভাষায় শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে; তাঁর গভীর মননশীল-সত্যসন্ধানী-পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা কখনোই সাধারণ পাঠকের কাছে বাধার পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায়নি—বরঞ্চ লেখনীর সহজবোধ্যতাই তাঁকে পাঠকমহলে জনপ্রিয়তম করেছে। তিনি বাংলা ভাষায় ত্রিশটির অধিক বেস্ট সেলার বই

লিখেছেন, এর মধ্যে খুব জনপ্রিয় বইগুলি হচ্ছে—অলৌকিক নয় লৌকিক, আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি, প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং... ইত্যাদি ।

'বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল' এদেশে অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার-চিরাচরিত প্রথার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের ধারা ভেঙে জনগণের জীবনাচরণে মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ প্রসারের নিমিত্তে কাজ করে চলছে। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল বাংলাদেশের সাধারণ জনগণসহ যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-আন্দোলন কর্মী, সেক্যুলার রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে 'যুক্তিবাদী-চিন্তা'র পরিচিতি ঘটানো ও প্রসারের উদ্দেশ্যে 'যুক্তিবাদ', 'নারীবাদ', 'সন্ত্রাস', 'উপাসনাধর্ম', 'সাম্যের সমাজ গঠন প্রক্রিয়া'সহ সমকালীন রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। সাক্ষাৎকারটি যুক্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। এ সংখ্যায় প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হল।

(১) বি. যু. কা. : আজ থেকে প্রায় একুশ বছর আগে আপনার হাত ধরেই 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' গঠিত হয়েছিল; এবং এই দীর্ঘ সময় ধরে আপনি যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত। আজকের ২০০৭ সালে এসে 'যুক্তিবাদী সমিতি'র আন্দোলন সম্পর্কে মূল্যায়ন কী?

প্রবীর ঘোষ : দেখতে দেখতে যুক্তিবাদী সমিতি (ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি) ২১ বছর অতিক্রম করল। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বাংলা সাপ্তাহিক 'পরিবর্তন' পত্রিকায় 'লৌকিক অলৌকিক' শিরোনামে বুজরুকি ফাঁস নিয়ে লেখার শুরু ১৯৮২ সালে। পাঠকেরা যেভাবে লেখাগুলো গ্রহণ করলেন, তাতে সত্যই আপ্লুত হলাম। পাশাপাশি চলতে থাকলো আমাদের 'থ্রি ম্যানস্ আর্মি'র (আমি, আমার স্ত্রী সীমা ও একমাত্র সন্তান পিনাকী) কুসংস্কারবিরোধী অনুষ্ঠান 'অলৌকিক নয় লৌকিক'। সেখানে ফাঁস করতাম নানা বাবাজি-মাতাজিদের তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য। হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতাম কী-করে বাবাজি-মাতাজিরা 'অলৌকিকতা'র ধুয়া তুলে লৌকিক কৌশল প্রয়োগ করে আপাত অবাস্তব যেসব কাজ করেন। চাক্ষুষ এসকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর বাবাজি-মাতাজিদের বিরুদ্ধে দর্শকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া আর উত্তেজনা লক্ষ্য করতাম। ঐ সময় সমমনোভাবাপন্ন মানুষদের সঙ্গে মত বিনিময় শুরু করেছিলাম; তাঁদের সাথে আড্ডা-আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক সবই হত। একটা সময় সবারই কথাবার্তায় যুক্তিবাদী সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার উঠে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের পহেলা মার্চ, বিকেলে দেবীনিবাসের আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটে গঠিত হল 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' (Science and Rationalists' Association of India), সংক্ষেপে 'যুক্তিবাদী সমিতি'। সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লেখা হল : "আমরা সমাজ সচেতনতার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ভারতের শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য এতাবৎকাল যে সকল সংগ্রাম হয়েছে তার ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ—সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করা। এ দেশের রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ শোষক ও তাদের সহায়ক শ্রেণিরা শোষিত মানুষকে সংগঠিত হবার সুযোগ দিতে নারাজ। তাই পরিকল্পিতভাবে ধর্ম, জাত-পাত, প্রাদেশিকতাকে ভেদাভেদের ভিত্তি হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। বঞ্চিত মানুষদের মাথায় ঢোকাতে চাইছে তাদের প্রতিটি বঞ্চনার কারণ অদৃষ্ট, পূর্বজন্মের কর্মফল, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়া। ... আমাদের যুদ্ধ শোষণের শক্তিশালীতম হাতিয়ার প্রতিটি কুসংস্কার ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে।"

জন্মলগ্ন থেকেই যুক্তিবাদী সমিতি ঝড় তুলে এগিয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা (বিশেষ করে 'আজকাল'), আকাশবাণী আমাদের কাজ-কর্মকে, বাবাজি-মাতাজিদের বুজরুকি ধরাকে বারবার তুলে ধরেছে। ১৯৯৩ সালের দিকে যুক্তিবাদী সমিতির কাজের পরিধি অনেক বেড়ে যায়—বিনা খরচে বস্তি ও গ্রামের শিশুদের এবং বয়স্কদের শিক্ষা, আইনি সাহায্য, কর্মশিক্ষা, চিকিৎসক নিয়ে গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প, পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কাউন্সেলিং, মরণোত্তর দেহদান-চক্ষুদান, রক্তদান শিবির, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বেশ্যাবৃত্তির মত নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বন্ধ করে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থার জন্য সরকারকে চাপ দেয়া, লিঙ্গবৈষম্য-ধর্ম-জাত-পাত ইত্যাদি কুসংস্কার ত্যাগ করতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণমূলক কাজ। সেই প্রয়োজন মেটাতে ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সালে গঠন করা হয় 'হিউম্যানিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'। ঐ সালেরই ১০ ডিসেম্বর যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে আবেদনপত্রের 'ধর্ম' কলামে উপসনা-ধর্মের (হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান ইত্যাদি) বদলে 'মানবতা' লেখার আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের এ বিশাল প্রাপ্তিতে সমস্ত দেশে তীব্র সাড়া পড়ে যায়; দলে দলে লোক এসে যুক্ত হতে থাকে আমাদের কাজকর্মে। ২০০০ সালের আগস্টে দেহব্যবসা বা পতিতাবৃত্তিকে আইনি করার চক্রান্তের স্বরূপ জনগণের সামনে বে-আব্রু করে রুখে দিয়েছি আমরা। ২০০৩ সালে ভ্যাটিক্যানসিটির পোপ দ্বিতীয় জন পল কর্তৃক মাদার টেরিজাকে 'সেন্টহুড' দেবার বিশাল তোড়জোড় ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি; সে এক বিশাল আন্দোলন, যুক্তিবাদিদের গণবিস্ফোরণ। বহু মানুষের উৎসাহ-ভালবাসা-সহযোগিতা, যুক্তিবাদের প্রতি সমর্থন-এর ফলেই এমন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছি আমরা।

যুক্তিবাদী সমিতি শুরুতেই সব তাস এক সাথে ফেলেনি। কেউ-ই শুরুতেই আস্তিনের সেরা তাসগুলো ফেলে না। সেরা দল বা খেলুড়ে সে-ই, যে প্রয়োজন বুঝে তাস বের করে। আমরা কাজ শুরু করেছিলাম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে, এরপর একে একে এগিয়ে যাচ্ছে—সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতি সচেতন মানুষ গড়া, বন্ধ্যা-দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্কৃতি ভেঙে সাম্যবাদের সংস্কৃতি গড়ার কাজ এগিয়ে চলছে। এই নির্মাণ পর্যায়ে গড়ে উঠবে স্বনির্ভর গ্রাম, কমিউন, সমবায়। আমরা মনে করি, সাম্যের সমাজ গড়তে গেলে আক্রমণের মোকাবিলায় প্রতি-আক্রমণ জরুরি। সংঘর্ষে যেতেই হবে। অসাম্য ভাঙতে সংঘর্ষ ও সাম্য আনতে নির্মাণ জরুরি; আবার এটাও মনে রাখতে হবে, মধ্যবিত্ত সমাজ হানাহানি, খুন-খারাবি পছন্দ করে না। কিন্তু মহাজনদের অত্যাচারে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে জর্জরিত গরিব মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকলে জান কবুল করে লড়াইতে নামতে পিছ-পা হয় না। ভারত থেকে নেপাল সর্বত্রই প্রয়োজনে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন গরিব দলিত সম্প্রদায়। সংগ্রাম সেখানেই সার্থক, যেখানে দলিতরা সংখ্যাগুরু।

দুর্বার স্রোতের সামনে সব বাধাই ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যাবে। অথবা নূতন পথ ধরে আমরা এগোবো। 'আমরা' মানে যুক্তিবাদীরা, মানবতাবাদীরা, সাম্যবাদীরা।

(২) বি. যু. কা. : ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য হতে কি কি যোগ্যতা, শাখা সংগঠন, কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকে বলুন।

প্রবীর ঘোষ : যুক্তিবাদী সমিতির 'সাধারণ সদস্য' হতে কোনো বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। যারা যুক্তিবাদী কাজ-কর্মে উৎসাহী, স্টাডি ক্লাসে যোগ দেয়, বর্তমানে 'খারাপ' বলে পরিচিত নয়, তেমন মানুষকেই 'সাধারণ সদস্য' পদ দেওয়া হয়। অবশ্য তাদের কম করে ১৮ বছর বয়স হতে হবে। ঠেলা চালক থেকে অধ্যাপক প্রত্যেকেই এভাবে সদস্য হন। সদস্য হতে চাইলেই 'সদস্য পদ' দেওয়া হবে— এমনটাও নয়। 'সাধারণ সদস্য' পদ পাওয়ার পূর্বশর্ত এই নয় যে, তাঁকে স্থুল কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে হবে। আমরা চাই আমাদের বিস্তার, যুক্তিবাদী চিন্তার বিস্তার, নতুনদের মধ্যে বিস্তার। 'নতুন' মানে এখনও যাঁরা যুক্তিবাদী চেতনার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছেন। তাঁদের হাতে তাবিজ থাকতে পারে, তারা রোজা-নামাজ মানতে পারেন, পূজা-প্রার্থনা করতে পারেন, আত্মাকে অমর মনে করতে পারেন, জিনে বিশ্বাস রাখতেই পারেন। তাঁরা যুক্তিবাদী সমিতির স্টাডি ক্লাসে যত বেশি বেশি করে যোগ দেবেন, প্রশ্ন করবেন, তাঁরাই একসময় 'যোগ্য সদস্য' হয়ে ওঠেন। 'কার্যকরী সমিতি' (Executive commitee) সাধারণ সদস্যদের মধ্যে থেকে 'যোগ্য সদস্য' নির্বাচিত করেন। যোগ্য সদস্য'রাই 'কার্যকরী সমিতি' নির্বাচিত করে। কার্যকরী সমিতির সদস্য হতে গেলে তাদের সমস্ত রকমের স্থূল কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে হয়। কার্যকরী সমিতির সদস্যরা সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদাধিকারীদের নির্বাচিত করেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ১২০টি শাখা-সংগঠন রয়েছে। শাখা হিসেবে কাজ করতে চাইলে যা যা জরুরি তা হলঃ— (এক) কম করে সাতজন আগ্রহী মানুষ, (দুই) যুক্তিবাদী সমিতির কাজ-কর্ম বিষয়ে পরিচিত, (তিন) যুক্তিবাদী সমিতির আদর্শে বিশ্বাসী, (চার) যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখিত আবেদন জানাতে হবে—শাখা হিসেবে কাজ করতে চাই। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হলে তাদের শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

যুক্তিবাদী সমিতি কখনই ভোট-ভিখিরি রাজনৈতিক দল নয়। তাই আমরা যা সমর্থন করি না, তা হল :— (এক) দলের সদস্য বাড়ানোকেই মূল লক্ষ্য করা, (দুই) সদস্যদের ন্যায়-অন্যায় বিচার না করেই তাঁর পাশে দাঁড়ানো, (তিন) সমাজবিরোধিদের পোষা।

আমরা যা চাই, তা হল :— (এক) আমাদের মতাদর্শ জাত-ধর্ম-লিঙ্গ-রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সকলের চেতনায় প্রথিত হোক, (দুই) আমরা চাই গুনতিতে দল না বাড়িয়ে বেশি মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করতে, (তিন) আমরা চাই চেতনার বিপ্লব, (চার) বিভিন্ন শব্দের সঠিক সংজ্ঞার সঙ্গে সাধারণ থেকে অসাধারণ মানুষদের পরিচয় ঘটানো। যেমন—রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতা, জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, যুক্তিবাদ ইত্যাদি। (চার) আমরা মনে করি কুসংস্কার দূর করাও শিক্ষা প্রসারের অঙ্গ। অশিক্ষা বিতাড়নের চেয়ে বড় শিক্ষা আর কী হতে পারে? (পাঁচ) নতুন সহস্রাব্দের শুরু থেকেই গৌতম বুদ্ধ, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, যিশু, মার্কস, লেলিন, মাও'দের মতো চিন্তাবিদদের স্বয়ম্বর গ্রাম, কমিউন বা সমবায় চিন্তার একটা নতুন রূপ, নতুন প্রয়োগ কৌশলের 'আইডিয়া' বা চিন্তা ছড়িয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছিলাম তা ২০০২-২০০৩ সালে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেলো।

আজ ভারতের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলে (ভারতের ৬০০টি জেলার মধ্যে ২০০টি জেলায়), নেপালের শতকরা ৮০ ভাগ অঞ্চলে, ভেনেজুয়েলায় পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে 'নতুন সাম্য চিন্তা' বা 'Neo-Sociliasm'-কে, (ছয়) 'যুক্তিবাদ' নিছক কুসংস্কার দূর করার মতবাদ নয়। 'যুক্তিবাদ' একটি জীবন-দর্শন, সম্পূর্ণ দর্শন, (সাত) 'যুক্তিবাদ' কোনো অনড় দর্শন নয়। যুক্তিবাদ সময়ের সঙ্গে

সঙ্গে পাল্টায়। শিখতে শিখতে পাল্টায়, পাল্টাতে পাল্টাতে শেখে (আট) যুক্তির পথ ধরেই আমরা যে কোনো কিছুকে বিশ্লেষণ করতে পারি, সত্যে উপনীত হতে পারি (নয়) যুক্তিবাদ শুধুমাত্র কুসংস্কারের অন্ধকারকে দূর করে না, তারচেয়েও অনেক বেশি কিছু। (দশ) যুক্তিবাদের পথ ধরেই মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, সাম্যবাদ, নব-সাম্যবাদ থেকে মানবতাবাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি।

(৩) বি. যু. কা. : আমরা জানি ভারতে বেশ কয়েকটি যুক্তিবাদী সংগঠন কাজ করছে; এবং নূতন নূতন সংগঠন গড়ে উঠছে। এগুলোর সাথে 'যুক্তিবাদী সমিতি'র উদ্দেশ্য ও কর্ম প্রক্রিয়ায় কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করেন কি?

প্রবীর ঘোষ : ভারতে যেসব বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংগঠন কাজ করে চলছে, তাদের কেউ কেউ গদিতে বসা রাজনৈতিক দলের শাখা। যেমন—পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের বড় শরিক সি পি আই (এম) এবং মেজ শরিক সি পি আই-এর বিজ্ঞান সংগঠন রয়েছে। এইসব বিজ্ঞান সংগঠনের নেতারা মূল পার্টির নেতা হতে যতটা তৎপর, ততটাই অনাগ্রহী বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ওদের কাছে বিজ্ঞান আন্দোলন একটা 'লোকদেখানো খেলা'। আসল বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতেই এইসব মেকি বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংগঠন গড়ে তোলা। ওরা ধর্মবিশ্বাসীদের আবেগে আঘাত করতে নারাজ। ওরা পার্টির ভোট কমে, এমন কোনো কাজ করেন না। ফলে ওরা শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের নামে পার্টির প্রয়োজনে যে কোনো অযৌক্তিক কাজ করে নির্দ্বিধায়। যারা ভোট-ভিখিরি রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ভাল'কে 'খারাপ' এবং খারাপ'কে 'ভাল' বলতে পারে, তাদের আর যাই হোক, যুক্তিবাদী বলা চলে না। আবার এমন যুক্তিবাদী সংগঠন এদেশে আছে যাদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা নেই। বিদেশের অর্থে চলে। তাদের সংগঠন আর যাই হোক সাম্যের সমাজ গড়াকে লক্ষ্য করে এগুতে অপারগ।

(৪) বি. যু. কা. : যুক্তিবাদী সংগঠনগুলো কাজ করার ক্ষেত্রে কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হয় বলে মনে করেন? এবং অসুধিাগুলো কিভাবে দূর করা সম্ভব ?

প্রবীর ঘোষ : আমি মনে করি শুধু যুক্তিবাদী সংগঠন নয়, অন্যান্য স্বনির্ভর গণসংগঠনের আন্দোলনের (কাজ করার) ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধে দেখা দিতে পারে, সেসব বিষয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন কর্মীদের সচেতন থাকা জরুরি। তাই এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি। অসুবিধাগুলি হল : (এক) আন্দোলন যখন শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থকে আঘাত করবে, তখন শোষক ও শাসক গোষ্ঠী সমস্ত গণসংগঠনগুলোকে আন্দোলনকারী সংগঠনের বিরুদ্ধে চর হিসাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। (দুই) শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে আন্দোলনের নেতার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার লাগাতারভাবে চালানো হয়ে থাকে। সংগঠনের কর্মীদের যেহেতু সাধারণভাবে সর্বোচ্চ স্বার্থত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকে না, তাই এই অবস্থায় কর্মীরা নিজের স্বার্থে নেতার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পছন্দ করে। অপপ্রচার কতটা সত্যি—জানতে নামার চেষ্টা করতেও ভয় পায়। (তিন) নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করলে বা সংগঠনের অফিসে পুলিশ রেড করলে তো কথাই নেই। বহুকর্মী মুহূর্তে সংগঠনের নাম পর্যন্ত ভুলে যায়। (চার) গণসংগঠনের অনেক নেতাই কম ঝুঁকি ও কম ত্যাগ করে বেশি রকমের আত্মপ্রচারে উৎসাহী হয়ে পড়েন। সাধারণভাবে তাঁরা মুখে বিপ্লব ও কাজে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা পছন্দ করেন; যেটাকে সোজা বাংলায় বলে ভণ্ডামি। (পাঁচ) গণসংগঠনে সব্বাই নেতা হতে চায়। স্বার্থে সামান্য আঘাত পড়লেই দল থেকে বেরিয়ে যায়; দল ভাঙার চেষ্টা করে। (ছয়) সমাজের স্বার্থে তাৎক্ষণিক লাভের আশায় চটকদার স্বল্পমেয়াদী কাজ করতে আগ্রহী হয়। (সাত) 'সংগঠনের কে কত গোপন খবর জানেন'—এটা পরিচিতদের কাছে জাহির করবার একটা প্রবণতা অনেকের থাকে। (আট) সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা খুব জরুরি। এটা অবশ্যই একটা অভ্যাস। ভারতে 'জরুরি অবস্থা' চালু হওয়ার আগে স্টেট ব্যাংক প্রধান শাখায় সময়ে উপস্থিতির হার ছিল খুব খারাপ। অফিস শুরুর সময় দশটায়। সাড়ে দশটায় হাজির আঙুলে গোনা। এগারোটা এমনকী সাড়ে এগারোটায় হাজির হতেন অনেকে। অনেকে এমনও বলতেন, দশটায় হাজির হতে হলে চাকরিই ছেড়ে দেবো। তাদের দেখেছি জরুরি অবস্থায় সুড়সুড় করে সময়ে অফিসে হাজির হতে। ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে লেট-এ যাওয়াই ছিল নিয়ম। জরুরি অবস্থায় সব ট্রেন চলতো টাইম টেবিল মেনে।

আমার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুধু এটুকুই বলতে চাইছি—এই দেরি করাটা অবশ্যই একটা অভ্যাস। কর্মসংস্কৃতির পক্ষে খারাপ অভ্যাস। সময়ানুবর্তিতা নিজে বজায় রাখুন, আপনার সহযোগিদের বজায় রাখতে শেখান। অনুষ্ঠানে যেতে হবে গ্রুপ নিয়ে? ঠিক সময়ে বেরিয়ে যান কে কে এলো না—না-ভেবে। কয়েকবার করলেই দেখেন, কাজ হবে।

(নয়) 'সংগঠন সবার'—এই বোধ তৈরি করা জরুরি। এমন বোধ সদস্যদের মধ্যে তৈরি হলে সবাই সংগঠনের জন্য অর্থ দেবেন, অর্থ সংগ্রহ করবেন। যে সংগঠন এক-দুজনের টাকায় চলে, সে সংগঠন কখনো-ই সব সদস্যের সংগঠন হয়ে ওঠেনি। সংগঠনের আর্থিক স্বনির্ভরতা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, গণসংগঠনটিকে রোজগার করতে কোনও ব্যবসায় নামতে হবে।

এতে হয়তো ব্যবসা হবে, কিন্তু সংগঠন তার কাজের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবে, এমন সম্ভাবনাই প্রবল। (দশ) কোনও গণসংগঠনের শাখা সংগঠন থাকলে অনেক সময়ই শাখাগুলো আর্থিক বিষয়ে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। অনেক সংগঠনের পক্ষেই শাখা সংগঠনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব। তারাই শাখাদের আর্থিক সাহায্য ঢেলে দিতে পারে, যারা দেশি-বিদেশি অর্থ সাহায্য পায় বা শাসকদলের গণসংগঠন হওয়ায় বিশাল ফান্ডের অধিকারী। যে সংগঠনের কেন্দ্র-ই চলে সদস্যদের টাকায়, তারা শাখাগুলোকে বলবেই আর্থিকভাবে শাখাকে স্বনির্ভর করুন। যেসব বুলেটিন, ম্যাগাজিন ও বইপত্র কেন্দ্র থেকে নিচ্ছেন, তার টাকা অবশ্যই দিন। নতুবা শাখার এমন মানসিকতায় কেন্দ্র দেউলে হবে। কেন্দ্রের কাজ-কর্মের গতি হবে রুদ্ধ। (এগার) সংগঠনবিরোধী কাজের জন্য মাঝে-মধ্যে কেউ না কেউ বহিস্কৃত হতেই পারেন। বহিস্কৃতের বন্ধু-বান্ধব নিশ্চয়ই সংগঠনে ছিল। এই পুরোনো বন্ধুত্বের সুবাদে কেউ কেউ বহিস্কৃতের সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতি জানান, সংগঠনের খবরাখবর পৌঁছে দিয়ে সংগঠন-বিরোধী কাজ করেন। সংগঠনকে নিজের মনে করলে, ভালোবাসলে এমন কাজ থেকে বিরত থাকুন। (বার) সংগঠনের কোনো নীতি ঠিক করা নিয়ে সংগঠনের ভিতর তুমুল বিতর্ক হতে পারে। ভোটে নীতিটি গৃহীত বা বর্জিত হতে পারে। পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু করে ভোট পড়বেই। যে মত ভোটে জিতলো সেই মত-ই সংগঠনের মত। ভবিষ্যতে এ নিয়ে সংগঠনের ভিতর আবার তর্ক-বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে— সংগঠনের বাইরে এমন বলা চলবে না যে, 'আমার মত সংগঠনের মত থেকে ভিন্ন।' এমনটা হলে স্পষ্টতই আপনি সংগঠন-বিরোধী কাজ করছেন। সংগঠনের নীতি পছন্দ না হলে আপনি সংগঠন ছেড়ে দিন। কিন্তু সংগঠনে থাকলে সংগঠনের মত-ই আপনার মত। (তের) এ দেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর হালহকিকত অবশ্য গণসংগঠনগুলোর সঙ্গে বেশ মেলে। দল ডুবলে কর্মীরা হাওয়া। দলের 'গোল্ডেন টাইম'-এ সবাই 'লিডার', কেউ 'ক্যাডার' পরিচয় দিতে রাজি নয়।

গণসংগঠনের এই সব সুবিধে-অসুবিধে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে গণসংগঠনকে ত্রুটিমুক্ত করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগামী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

আন্দোলনের শত্রুরা : যেদিন যুক্তিবাদী আন্দোলন দুর্বার গতি পাবে সেদিন দিকে দিকে নবজাগরণ দেখতে পাবো। দলিত মানুষরা আর দলিত থাকবে না। স্বয়ম্বর গ্রামের একজন হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। স্বয়ম্বর গ্রাম বা কমিউন যাঁরা করছেন, তাঁরা যে নামেই করুক, তাতে কিবা এসে যায়! যুক্তিবাদী সমিতি সাম্য প্রতিষ্ঠায় একটা 'আইডিয়া' বা মতাদর্শ প্রচার করে চলেছে। এই মতাদর্শ সাধারণ থেকে অসাধারণের মধ্যে দাবানলের মতোই দ্রুত ছড়াচ্ছে।

অসাম্যের সমাজকাঠামোকে যখন আঘাত হানবো, তখন প্রত্যাঘাত তো আসবেই। রাষ্ট্রশক্তি আঘাত হানতে পার নানাভাবে। মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার, আন্দোলনকারিদের বিভিন্ন অফিসে ও বাড়িতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হামলা, এনকাউন্টারে নামে হত্যা—এর সবই করবে। পাশাপাশি রাষ্ট্রশক্তি আন্দোলনকারিদের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটাবে, ভয় ও লোভ দেখিয়ে দলে টানবে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে—লোভ, ঈর্ষা, হুজুগ ও ভয় যেন চেতনাকে আচ্ছন্ন না করে।

যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে নাট্য আন্দোলন—সবেরই অন্যতম প্রধান শত্রু আমাদের চেতনা, আমাদের মন। আমাদের চেতনায় থাকতেই পারে লোভ, ঈর্ষা, হুজুগ, ভয়। বাইরের শত্রুদের চেনা সহজ, ভিতরের শত্রুদের চেনা কঠিন। এদের বিরুদ্ধে লড়াইটাও কঠিন।

লোভ : সেই গোষ্ঠীপতি ও রাজাদের আমল থেকে চলে আসছে শত্রুদের খবর নিতে, শত্রুশক্তিতে ভাঙন ধরাতে, শত্রুরাজার সেনাপতি বা মন্ত্রীকে কিনে নিতে লোভের টোপ ঝুলিয়ে দেওয়া। উৎকোচ হিসেবে কখনও পাঠানো হত রত্ন-স্বর্ণমুদ্রা, কখনও বারবনিতা। কখনোবা করের বিনিময়ে 'রাজা' করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত। আজও সেই 'ট্রাডিশন' সমানে চলছে। এমন উৎকোচের লোভ কখনও বাইরে থেকে আসে; কখনও নেতা হওয়ার লোভ, প্রচারে আসার লোভ মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে।

ঈর্ষা : এই বিষয়ে আমি শ্রদ্ধেয় নাট্যকার-নাট্যপরিচালক-অভিনেতা-নাট্য আন্দোলনের নেতা শম্ভু মিত্রের একটি লেখার কিছু অংশ তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না:—"একটা দল তো একটা সমাজের মতো, সেখানে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করেই আমার অস্তিত্ব। সুতরাং যখনই কোনও আলোচনা হবে, তখন আবার মনের কথা খুব সুস্পষ্টভাবে বলা উচিত। কারণ সকলের সকল চিন্তাধারা স্পষ্টভাবে উপস্থিত না হলে কার কী সত্যকার অসুবিধা এবং কোনটা দলের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ সেটা বোঝা যাবে কী করে? অথচ এই লেখকের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে—এটা মুখে সকলেই মানে, কিন্তু কাজে খুব কমসংখ্যক লোক করে। তার কারণ, তারা কাজটাকে দলের কাজ হিসাবে দেখে না, নিজের অংশটাই দেখে। তাই রাগ হলে, হয় কিছুই বলে না—আস্তে আস্তে সরে যায়, আর নয়তো কুৎসিত ঝগড়ার অবতারণা করে। এই প্রবণতা আমাদের আছে বলেই সবসময়ে আলোচনা করা হবে বা বিচার করা হবে, দলের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকে লক্ষ্য রেখে। ..."

"... সকলে মিলে বসে যেমন দলের মূলকথা বা আইন ইত্যাদির প্রণয়ন করা চাই, তেমনই অনেক কাজে আবার ব্যক্তি বিশেষকে ভারও দেওয়া চাই এবং তাকে মানাও চাই—এইখানেই আবার একটা গণ্ডগোলের জায়গা। আজকাল ডেমোক্র্যাসি কথাটি আমরা সকলেই জানি এবং যে যার নিজের মতো একটা ব্যাখ্যা করে নিই। ভাবটা হয় যে, আমরা সবাই সমান।... কাউকে কোনও ব্যাপারে বড় বলে না মানা। কেউ হুকুম করলেই রাগ করা এবং সবসময়ে মনে মনে ভাবা যে আমাদের 'এক্সপ্লয়েট' করে দলের কর্তারা সবটুকু মধু যেন নিঃশ্বাসে চেটে-পুটে নিচ্ছেন।"
"এসব ক্ষেত্রে কতগুলো মূলকথা বোঝা দরকার। যেমন ভীষণ সাম্যবাদী দেশেও যদি সাধারণ সৈনিক রাত্রে জেগে পাহারা দিতে অস্বীকার করে এবং বলে যে সেনাপতি যদি রাত্রে পাহারা না দেয় তাহলে আমিই বা রাত জাগব কেন, তাহলে তাকে কোর্টমার্শাল করা হয়। গাড়ির পিছনের চাকাটা যদি বলে সামনের চাকাটা কেন আগে আগে যাবে, আমিও যাব, তাহলে সেটা গাড়ির অগ্রগতিরই বিরুদ্ধতা করে।"
"মানুষ সবাই এককাজে একইরকমভাবে উপযুক্ত হয় না, এক একজন এক এক কাজে পারদর্শী হয়। সেইজন্য যে গান গায় তাকে মঞ্চসজ্জার জন্য ধুলোর মধ্যে কাজ করাতে নেই। করালে সংঘেরই ক্ষতি, অভিনয়ে গান খারাপ হবে। তখন ডেমোক্র্যাটিক অধিকার বলে আর একজন অ-গাইয়ে কিন্তু হঠাৎ গানটি গেয়ে দিতে পারবে না। তেমনই যে নাটক লেখে সেও একটা বিশেষ কাজ করে এবং খুব কঠিন কাজ। সেখানে ডেমোক্র্যাটিক অধিকার বলে সকলে মিলে বসে এক এক লাইন করে লিখে একটা নাটক লেখা যায় না।" ('আন্দোলনের প্রয়োজনে' প্রবন্ধের অংশ, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে 'সন্মার্গ সপর্যা'তে।)

ব্যক্তি ঈর্ষার কারণেই অনেক রাজনৈতিক দলে 'বারো রাজপুত্তুরের তেরো হাঁড়ি' হতে আমরা দেখেছি, দেখছি। অনেক সংগঠনই একই কারণে বিভাজিত হয়েছে। মনে ঈর্ষা ও মুখে নীতির দোহাই, এখনও অনেক দেখা বাকি। গত শতকের ছ'য়ের দশকের শেষভাগে দেখেছি কলেজস্ট্রিট কফি হাউসে নকশাল স্টুডেন্ট লিডারদের নানা গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড। গোটা দশেক নেতা-নেত্রীকে ঘিরে গোটা দশেক গ্রুপ। এই গ্রুপ-এর পিছনে কোনও আদর্শগত বিভেদ ছিল না। ছিল ছেঁদো অজুহাত। আসলে যা ছিল, তা হলো—ব্যক্তিত্বের সংঘাত। কটু ভাষায় বলতে গেলে 'ঈর্ষা'।

হুজুগ : হুজুগের গতি যুক্তির বিপরীতে। হুজুগ বা গণহিস্টিরিয়া যুক্তি-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা গুলিয়ে দিয়ে ভেড়ার পালে যূথবদ্ধ করে দেয়। ভেড়ার সেই স্বভাব তো জানেন। প্রথম ভেড়াটির সামনে একটা লাঠি ফুট খানেক উঁচু করে ধরুন। ভেড়াটি লাফিয়ে লাঠি পার হবে। এবার লাঠিটি সরিয়ে নিন। দেখবেন পালের সব ভেড়াই ওইখানে এসে লাফিয়ে পার হচ্ছে। হুজুগ একই ব্যাপার। হুজুগে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। দেখতে চায় না, শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না, বিচার করা তো দূরের কথা। হুজুগে মেতে যাঁরা সত্যানুসন্ধ্যানের চেষ্টা না করে সত্যের থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে তাঁরা যুক্তিবাদী নন; বরং যুক্তিবাদের শত্রু। হুজুগ বা গণউন্মাদনা হল বাড়তি আবেগ। খাবারে বাড়তি নুন, যা খাবার নষ্ট করে। আবেগহীনতা হল নুন দিতে ভুলে যাওয়া, যা খাবারকে নষ্ট করে। সঠিক আবেগের নুন খাবারকে স্বাদু করে।

ভয় : ইন্দিরা জমানার জরুরি অবস্থায় অনেক 'আগুন খাওয়া বিপ্লবী' অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে হাওয়ায় মিশে গিয়েছিলেন—আমরা দেখেছি। কোনও সংগঠনে পুলিশ 'রেড' করেছে শুনলে ভয়ে সদস্যরা সংগঠনের নাম পর্যন্ত ভুলে যান—এও তো দেখেছি। আর কতকাল দেখব, কে জানে?

আন্দোলন ভাঙতে 'ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি' এক অতি কার্যকর অস্ত্র। কোনও আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠলে, সরকারের প্রচণ্ড অস্বস্থির কারণ হয়ে উঠলে সরকার তখন 'ভয়'-এর অস্ত্রটি ব্যবহার করে। আন্দোলনকারিদের উপর লেলিয়ে দেয় মিলিটারি আধা মিলিটারি–পুলিশ ও পার্টির বাহুবলধারিদের। ওরা দলবদ্ধভাবে আন্দোলনকারিদের উপর হামলা চালায়। অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ চালায় পরম নিশ্চিন্তে। কারণ সরকার আর শাসকদল যখন বলেই দিয়েছে, 'ম্যায় হুঁ না', তখন আবার ভয় কী? ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার চালিয়ে সবসময় যে আন্দোলন, বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম বন্ধ করা গেছে, তেমন নয়। তবু অনেক সময় 'ভয়' অত্যন্ত কার্যকর অস্ত্র। প্রিয়জনকে আটকে রেখে, তার উপর অত্যাচার করে বিপ্লবীর কাছে থেকেও কথা বের করা গেছে।

খাঁটি বিজ্ঞানমনস্ক এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মী হতে গেলে লোভ, ঈর্ষা, হুজুগ ও ভয়—এই চার শত্রুকে পরাজিত করতেই হবে। যুক্তিবাদী সমিতি মনে করে, কোনো সমাজ পরিবর্তন-ই সার্থক হয় না যুক্তিমনস্ক বিবেক ছাড়া।

চলবে ...

স্বেচ্ছামৃত্যু

সুমিত্রা পদ্মনাভন

'ইউথেনেশিয়া' (Euthanasia) গ্রিক শব্দের অর্থ—ভাল মৃত্যু (Eu=ভাল, Thanatos= মৃত্যু)। অর্থাৎ 'মৃত্যু যখন কাম্য'; যখন বেঁচে থাকা আরও দুর্বিষহ। নিজের ইচ্ছায় হোক বা আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনের ইচ্ছায় হোক, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে হোক, যখন মৃত্যুই বরং ভাল মনে হয়—তখন দুভাবে সেই মৃত্যুকে ডেকে আনা যায়। এক—ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া যায় চিরতরে। দুই—জীবনদায়ী চিকিৎসা, যেমন অক্সিজেন, স্যালাইন, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি বন্ধ করে দিয়ে রোগীকে মারা যেতে দেয়া হয়।

স্বেচ্ছামৃত্যুর এই গ্রিক প্রতিশব্দটাই ইংরেজিতে চালু। তাই বোঝা যায় বহু বছর আগে থেকেই এই ধারণাটা আছে। তখন মানুষের-সমাজ এত জটিল ছিল না, দুর্নীতি এত সর্বগ্রাসী ছিল না। ভালবাসার মানুষকে কষ্ট পেতে দেখলে, যখন জানি সে আর সুস্থ হবে না কোনোদিন, তখন তাকে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু উপহার দেওয়াই তার জন্যে সবচেয়ে ভাল কাজ। আমরা এখন পোষা কুকুরকে, পা ভেঙে যাওয়া প্রিয় ঘোড়াকে যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে ঘুম পাড়িয়ে দিই। এটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে; সিদ্ধান্ত নেন পশুর মালিক, ইঞ্জেকশন দেন চিকিৎসক। ব্যাপারটা এতটাই সোজা এবং মানবিক। এখন, কেন মানুষের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াতে এত বাধা? আমরা জানি দুটো দেশে স্বেচ্ছামৃত্যু আইনি, (এক) হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ড (দুই) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন স্টেট। এই দুই জায়গায় একজন মানুষ স্বাধীনভাবে তার মৃত্যু নিজেই চাইতে পারে। আইনজীবী ও ডাক্তারের পরামর্শ ও সহায়তা নিয়েই কাজটি করা হয়। তবু যত লোক আত্মহত্যা করতে চায়, তারা সবাই শেষ পর্যন্ত করে না; কাউন্সেলিং-এর পর অনেকের সিদ্ধান্ত বদলে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অনেক রাজ্যে 'প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া' চলে। অর্থাৎ মৃত্যুপ্রায় মানুষকে তার বাড়ির লোকের অনুরোধে আর জীবনদায়ী ওষুধ-বিষুধ, যন্ত্রপাতি দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয় না। শুধুমাত্র 'বেঁচে থাকুক'—এই অজুহাতে তার জীবনকে আর লম্বা করা হয় না।

আত্মহত্যার অধিকার কেন আইনি করা উচিৎ নয়, তার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে যেগুলো এক একটা করে খণ্ডন করা যায় সহজেই:—
(এক) জীবন দিতে পারি না, নেব কোন অধিকারে? : এটা একেবারে বকওয়াস। জীবন নিতে যদি এতই আপত্তি তাহলে এত যত্ন করে সুস্থ সবল যুবক-যুবতীদের কেন মারণ অস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়? কেন যুদ্ধে পাঠানো হয় অপর দেশের একইরকম নির্দোষ মানুষদের মেরে ফেলার জন্য অস্ত্র হাতে দিয়ে? এটা যারা বলে তারা আগে 'অস্ত্র' তৈরি বন্ধের প্রচেষ্টা শুরু করুক। সেনাবাহিনী তুলে দিক।

(দুই) ধর্মের বাধা:— জৈনধর্মে স্বেচ্ছামৃত্যু অনুমোদিত। সবাইকে বলে-কয়ে খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে একজন মৃত্যুবরণ করতে পারে। কেউ বাধা দেয় না। জানি না সেটা কতটা যন্ত্রণাহীন, তবু তো একজন বয়স্ক মানুষকে তার নিজের জীবনের ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছে প্রয়োগ করার সম্মান দেওয়া হয়। এটাই বা কম কী! হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী এবং মহাকাব্যেও স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা পাওয়া যায়। তাছাড়া কোনো ধর্মে বারণ থাকলেই বা কী? 'ধর্ম মানি না'—বলতে তো কোনো বাধা নেই।

(তিন) কাউকে Terminally ill অর্থাৎ বাঁচার আর কোনও সম্ভাবনা নেই এমনভাবে অসুস্থ বলা হল, তারপর হয়ত দেখা গেল সেই রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হল, অথবা জানা গেল ডাক্তারদের বুঝতে ভুল হয়েছিল, ওটা আসলে সারতেও পারতো। তাহলে?

এক্ষেত্রে ভুল যাতে না হয়, তার জন্য নিশ্চয়ই বিশিষ্ট একাধিক অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। তবে ভবিষ্যতে ওষুধ বেরোতে পারে—এটা কোনো যুক্তি নয়। তৎকালীনভাবে সারার সম্ভাবনা না থাকলে এবং রোগী কষ্ট ভোগ করলে রোগীর অনুরোধেও তার মৃত্যু ডেকে আনা অত্যন্ত মানবিক। আর রোগী যদি জ্ঞানে না থাকেন, নিজে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হন, তাহলে যে বা যারা তার চিকিৎসা চালাচ্ছে তাদের ইচ্ছাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে খরচ বহন করলেও, দেখা যায় বহুদিন রোগী হাসপাতালে 'বেড' দখল করে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছেন, এবং রোগীর আত্মীয় স্বজন ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন, উৎসাহ হারাচ্ছেন। অথচ অনেক জলজ্যান্ত রোগীকে হাসপাতাল ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে, স্থানের অভাবে। তৎক্ষণাৎ ভর্তি করে বিশেষভাবে ICU বা ICCU-তে চিকিৎসা করালে তাদের বাঁচানো যেত, কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ার কারণে তারা মারা যাচ্ছেন। কোমা বা সেরে ওঠা অসম্ভব এমন রোগীদের মৃত্যুকে মেনে নিলে তিনটে উপকার হয়—প্রথমত, রোগীর আত্মীয়-স্বজন অযথা খরচ ও পরিশ্রমের হাত থেকে বেঁচে যান। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থায়, যেখানে প্রয়োজনীয় শয্যাসংখ্যা নেই, সেখানে আরেকজন সেরে ওঠা

সম্ভব এমন রোগীকে ভর্তি করা যায়। তৃতীয়ত এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রথম রোগীর মৃতদেহ দান করা যায় হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই। তার দেহের সুস্থ অঙ্গ অনেকগুলি মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে। এ অত্যন্ত মানবিক কাজ, যা রোগীর আত্মীয় পরিজনই শুধু করতে পারেন। নিয়ম হচ্ছে মৃত্যুর পর অপারেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অঙ্গ সংগ্রহ করে হাসপাতাল দেহ ফিরিয়ে দেয় এবং তখন আত্মীয়রা তার সৎকার করতে পারেন। মনে পড়ছে হায়দ্রাবাদের (ভারতের) ভেঙ্কটেশকে, যে ২০০৪ সালে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে দেহ দান করতে চেয়েছিল। কুড়ি বছরের ছেলেটির মায়েরও সায় ছিল এতে। কিন্তু সম্ভব হল না শুধুমাত্র 'স্বেচ্ছামৃত্যু বেআইনি'—এই কারণে। এর ফল হল—

১। ছেলেটি মারাই গেল—আরও কিছু বেশিক্ষণ কষ্ট পেয়ে।

২। তার শেষ ইচ্ছা পূরণ হলো না। মা আরও বেশি দুঃখ পেলেন।

৩। তার দেহ কোনো কাজে লাগলো না। তার দেহাংশ নিলে অন্তত চার-পাঁচজনকে অবশ্য মৃত্যুর হাতে থেকে বাঁচানো যেত। দশ-বারোজনের বিভিন্ন দূরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করা যেত।

এই আইন কার জন্য? মানুষের ভালোর জন্য, না আইন শুধু আইনের জন্য? একসময় গর্ভপাতকেও হত্যা মনে করা হতো, বেআইনি ছিল। এখন মানুষের সুস্থ, সুন্দর জীবনের প্রতি সম্মান জানিয়ে গর্ভপাত আইনি। আইন পাল্টেছে। আশ্চর্য লাগে, বিদর্ভের কুড়িজন কৃষক আত্মহত্যা করতে চেয়ে সরকারের কাছে চিঠি দিল। তাদের পা থেকে মাথার চুল অবধি বিকিয়ে গেছিল ঋণের দায়ে। তাদের তখন বাঁচার কোনও উপায় নেই, ইচ্ছাও নেই, সম্ভাবনা নেই। কই সরকার তো বলল না—'না আত্মহত্যা বেআইনি—আমরা তোমাদের বাঁচাবোই বাঁচাবো'। এখন পর্যন্ত হাজারের ওপর তুলোচাষী সরকারী অব্যবস্থার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছে গত তিন বছরে। রাষ্ট্র নিশ্চেষ্ট, বসে-বসে দেখেছে। কে বলেছে আত্মহত্যা বেআইনি? অন্তত এই রাষ্ট্রের কোনো অধিকারই নেই এমন কথা বলার। সোমালিয়া থেকে আমলাশোলের মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়, মারা যায় উড়িষ্যার কালাহান্ডির মানুষ। রাষ্ট্রের তাহলে বক্তব্য—হ্যাঁ তোমরা ঋণে জর্জরিত হয়ে, অভুক্ত থেকে, চোখের সামনে শিশু সন্তানের মৃত্যু দেখেও বেঁচে থাকো, তিল তিল করে অপমান, অসহয়তা, অসুস্থতা নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাও।

যে সরকার বাঁচার মতো অবস্থা দিতে পারে না, জেনে বুঝেও ব্যবস্থা করতে পারে না—তার এ কথা বলা তো সাজেই না—বরং সে হত্যাকারী। আমরা জানি সরাসরি বধূ হত্যা না করেও বধূর আত্মহত্যার দায় নিতে হয় শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামীকে। আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারী হিসেবে। তাহলে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কেন হত্যাকারী হিসেবে শাস্তি পাবে না? তাই, বাঁচবে কি বাঁচবে না, সেটা যার জীবন সেই ঠিক করবে। এখানে রাষ্ট্রের কিছু বলারই থাকতে পারে না। হঠাৎ করে আবেগের বশবর্তী হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করার সিদ্ধান্ত নিলে সেটা অবশ্যই দুঃখজনক। তাকে আটকাতে পারে তার নিকটজন। কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করে তাকে তাৎক্ষণিক উত্তেজনার অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর আঠারো বছর বয়সের নিচে কোনো শিশু বা কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যা করলে অবশ্যই তার দায় নিতে হবে তার পিতামাতাকে। তাদেরই তো কর্তব্য তাদের সন্তানের জীবন সুস্থ, সুন্দর করার। তাদের জানার কথা ছিল, তাদের সন্তান সুখে নেই—তারা দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে আসি। একজন মানুষ তার জীবনের সায়াহ্নে এসে যদি মৃত্যুবরণ করতে চান যে কোনও কারণে, তাহলে তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান জানানো অবশ্যকর্তব্য। কারণ হিসাবে যা কিছু হতে পারে। হতে পারে অসুস্থতা, বার্ধক্য, অকালবার্ধক্য, একাকীত্ব, অনেক কিছুই। জীবনের শেষে মৃত্যুই সুন্দর, স্বাভাবিক। মৃত্যুকে কুৎসিত করেছে মানুষ। চিকিৎসাশাস্ত্র অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু সেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যবহারকারী মানুষ অনেক সময়ে ভুলে যায় চিকিৎসার উদ্দেশ্য রোগ সারিয়ে তুলে মানুষকে সুস্থ সুন্দর জীবনকে ফিরিয়ে দেওয়া, জীবনকে শুধুমাত্র দীর্ঘায়িত করা নয়।

(চার) সবচেয়ে মারাত্মক যুক্তি হচ্ছে আত্মহত্যা, স্বেচ্ছামৃত্যু বা ইউথেনেশিয়া আইনি করলে আইনের অপপ্রয়োগ হবে, অর্থাৎ তা 'হত্যার অধিকার' হয়ে যাবে। সেই হত্যা অভিসন্ধিমূলকও হতে পারে। কিছু আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তাঁরা মনে করেন, আমাদের দেশে এই আইনের অপব্যবহার হবেই।

দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ সব দেশেই আছে। তারাই আইনের অপব্যবহার করে। কিন্তু যেখানে দুর্নীতি একেবারে উপর তলা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে নামে সেখানে এটা স্বতঃসিদ্ধ। শুধুমাত্র বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভেন্টিলেটার ইত্যাদি দিয়ে যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও হৃৎপিণ্ডটিকে চালিয়ে রাখা হয়, আর লক্ষ লক্ষ টাকা বিল দিতে হয় রোগীর আত্মীয়দের তখন আইনের অপপ্রয়োগ হয় না? বাঁচিয়ে রাখার আইন—সারিয়ে তোলার নয়।

কিন্তু তাই বলে আইন থাকবে না—এটা তো হাস্যকর যুক্তি। যেমন পুলিশ বলে হিউম্যান রাইটস-এর কর্মীদের জ্বালায় আমরা ভাল করে কাজ করতে পারি না—গ্রেপ্তার, মারধোর করতে গেলেই তারা রে রে করে ওঠে। তাই বলে কি পুলিশ থাকবে না? না, হিউম্যান রাইটস বলে কিছু থাকবে না? আর আইন সব দেশে সবকালের জন্য। কোনো দেশে তার প্রয়োগ ঠিকমত নাও হতে পারে, এই ভেবে বসে থাকলে চলে না। আইন নীতিগতভাবে যেটা সব মানুষের জন্য ভাল সেটাই মেনে নেবে। তার প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে বিভিন্ন হতে পারে।

আমরা দেশের জন্য প্রাণ দেয়াকে মহান মনে করি। দেশের স্বাধীনতার জন্য বা অন্য কোনো ন্যায্য দাবি নিয়ে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দিলে তাকে আটকাই না। বরং তারা সব মহান শহিদ—এই মনে করি। পথ-দুর্ঘটনার সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় যেসব দেশে, তার মধ্যে আমাদের দেশ একেবারে প্রথম সারিতে। এ নিয়ে কারুর মাথাব্যাথা নেই। শুধু কোনো বেচারা নিজে মৃত্যুবরণ করে তার দেহ অন্যের প্রয়োজনে দান করতে চাইলে যত বাধা! অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েও তাকে বেঁচে থাকতেই হয়।

আমাদের দেশে তথা সারা পৃথিবীতে বহু লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে প্রতিবছর তার সবকটি নথিভুক্তও হয় না আত্মহত্যা বলে। আমরা কেউ আটকাতেও পারি না এইসব মৃত্যু। স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার স্বীকার করে নিলে এইসব মৃত্যু আরও অনেক সুন্দর হবে। আইনের শৃঙ্খলার মধ্যে আনলে তা অনেক ন্যায়বিচার পাবে। ডাক্তার ও আইনজীবীর পরামর্শে এবং বাড়ির লোকের উপস্থিতিতে একজন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা মর্যাদা পাবে। সেক্ষেত্রে তার সম্পত্তি নিয়ে গণ্ডগোল বরং কম হবে, কারণ উইল করে যাওয়া বাধ্যতামূলক হবে।

কত বিকলাঙ্গ, অসুস্থ শিশু জন্মায় স্বল্প আয়ু নিয়ে। বাবা, মা চোখের জলে অপেক্ষা করে থাকে কবে সে মরে বাঁচবে? তার জীবনই শুধু যন্ত্রণাময় নয়, তার বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের জন্য এই শিশুর অস্তিত্বই কষ্টদায়ক। এখানে শেষ কথা শিশুর বাবা, মা-ই বলতে পারেন। ডাক্তার সাহায্য করবেন শুধু।

আরেকটি উদাহরণ, যেটি আমাদের দেশে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক সেটা দিয়ে লেখা শেষ করব। সেটা হচ্ছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি সমাজ তথা সংসারের ঔদাসীন্য। কি গ্রাম, কি শহর, কি নিম্নবিত্ত কি উচ্চবিত্ত—সর্বত্রই দেখা যায় শেষ জীবনে অশক্ত বৃদ্ধরা, উপার্জনহীন বৃদ্ধারা অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েন। সরকার বা সমাজ কেউই আর এদের নিয়ে চিন্তিত নয়। ফলে যারা বেশিদিন বাঁচেন তাঁদের অনেকেরই জোটে চরম অবহেলা, অযত্ন ও একাকীত্ব। সেটা দূর করার জন্য তেমন কোনো সামাজিক সচেতনতা এখনও দেখা যাচ্ছে না। না আছে তাঁদের জীবনে আনন্দের কোনো উপকরণ, না আছে তাঁদের অভিযোগ জানাবার কোনো জায়গা। তাই জীবন দীর্ঘ হলেই সবসময় ভাল হয় না। তবু আমরা মৃত্যু চাইব না? যে কোনো প্রকারে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখব যতদিন পারি? —এটাও একরকম কুসংস্কার।

অবাধ শিশুজন্মের সময় শিশুমৃত্যুর হারও বেশি ছিল। এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্মের উপর নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই সমাজকে আরও সুন্দর ও সুস্থতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই না? ঠিক সেরকম, চিকিৎসা ও বৃদ্ধদের পরিচর্যার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মৃত্যুর উপরও নিয়ন্ত্রণ আনা প্রয়োজন। আমরা নিশ্চয়ই চাই না পৃথিবী অসুস্থ, অতিবৃদ্ধ, জীবন্মৃত বা অসুখী মানুষে ভরে যাক।

আইন ও ধর্মীয় অনুশাসন আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে চালিত করে। ধর্ম বলে, জীবন ঈশ্বরের দান, আমরা কেড়ে নিতে পারি না। আইনও এ ব্যাপারে ধর্মেরই হাত ধরাধরি করে আছে। একই যুক্তিতে ভ্রূণ হত্যাও এতকাল নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন ধর্মীয় অনুশাসন, বা বলা যায় ধর্মীয় অজ্ঞানতা ও আইন মানবতা বিরোধী মনে হয়—তখন? তখনই তো আইন পাল্টানোর দাবি ওঠে—তাই না? আইনের অপব্যবহার হতে পারে ভেবে আইন প্রণয়ন করবো না—এটা কেমন যুক্তি? আসলে জ্ঞানের প্রসার ও বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ধারণা ও আইন পাল্টাতে বাধ্য। প্রতি বছর প্রচুর নতুন আইন তৈরি হচ্ছে সারা বিশ্বে। এক সময়ে মানুষ মৃত্যুকে এতটাই ভয় পেত, অস্বাভাবিক মনে করত বলেই মৃত্যুর পর আত্মার কল্পনা, মৃতদেহ ঘিরে কুসংস্কার, মৃতমানুষকে নিয়ে শোক পালনের এত বাড়াবাড়ি। অমর হওয়ার চেষ্টা, মানুষের আয়ুকে বাড়ানোর নানারকম টোটকা, কলাকৌশল হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেক চেষ্টা করেও গড়আয়ু বাড়াতে পেরেছে মাত্র। এই গড়আয়ু বাড়ানোটাই একটা বিশাল অগ্রগমন। সত্যিকারের প্রজাতি হিসেবে একজন মানুষের সম্ভাব্য আয়ু বাড়াতে পেরেছ কি? তার সঙ্গে জীবনের শেষ দিন অবধি সুস্থ থাকার কৌশল? তা না হলে জীবনের দৈর্ঘ্যের কী মূল্য আছে? আজ আমরা স্বীকার করি রোগে ভোগা দীর্ঘ বার্ধক্যের 'অভিশাপ'। তাত্ত্বিক কারণে শুধু বাঁচার জন্য বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে তাই দেখতে পাই সেই পুরোনো কুসংস্কার। অমরত্ব আজ আর জীবনের দৈর্ঘ্যে নয়—মানুষের কাজে, আবেদনে, তার ধ্যান-ধারণায়, তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্যতায়।

যুগে যুগে আইনের সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে বিরোধ মানবাধিকার কর্মীদের। এভাবেই নতুন আইন তৈরি হয়। ধর্মকথা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আপাতত মানবতার খাতিরেই আইন পাল্টানোর সময় এসেছে। মনে রাখতে হবে প্রতিটি জীবন যেমন আলাদা, প্রতিটি মৃত্যুও আলাদা হতে বাধ্য। তাই স্বেচ্ছামৃত্যুরও ক্ষেত্র, প্রয়োজনীয়তা, অবস্থান আলাদাই হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডাক্তার, আইনজীবী ও নিকটাত্মীয়দের নিয়ে একটা কমিটি হবে যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সর্বসম্মতিক্রমে। 'মৃত্যুর অধিকার' এই ধারণাটাই সারা বিশ্বে, সমস্ত দেশে চালু করার সময় হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে মরার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। জীবন সুন্দর, এই পৃথিবী সুন্দর-বেঁচে থাকার তাগিদ কোনোদিন শেষ হবে না। তাই মৃত্যুর অধিকার কখনও কর্তব্যে পরিণত হবে না যাতে কেউ মনে করবেন এখন আমার কর্তব্য মৃত্যু বরণ করা। অর্থাৎ 'রাইট টু ডাই' কখনও 'ডিউটি টু ডাই' হয়ে যাবে না। বাঁচার আনন্দ মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি। সেই আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে যদি জানি শেষে সুন্দর যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর আশ্রয় সুনিশ্চিত।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—"ইতালির কবি পিয়েরজর্জিও ওয়েলবি গত একদশক ধরে দুরারোগ্য পেশির অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন। স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার চেয়ে কম্পিউটারের কি-বোর্ডে আঙুল চালিয়েই লিখেছেন, 'লেট মি ডাই'। অদম্য ছিল কবির চিন্তাশক্তি। স্বেচ্ছামৃত্যু চেয়ে আইনি লড়াই চালিয়ে গেছেন প্রশাসন থেকে চার্চের অমানবিকতার বিরুদ্ধে। ২২ ডিসেম্বর ২০০৬-এ তাঁর বন্ধু অ্যানেস্থেটিস্ট মারিও রিচ্চিও কবিকে বেশিমাত্রায় ঘুমের ওষুধ দিয়ে চিরশান্তির ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। দিলেন অসহ্য কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি। চিরনিদ্রায় যাওয়ার আগে কবি তাঁর বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। রিচ্চিও'র বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু তাঁর পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন প্রচুর মানুষ। সোচ্চার মানুষের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে।"

ভারতে স্বেচ্ছামৃত্যুকে আইনি করার জন্য বিল আসতে চলেছে 'ইউথেনেশিয়া (পারমিশন এন্ড রেগুলেশন) বিল ২০০৭'। বিলটি পেশ করতে চলেছেন কেরালার এমপি সি. কে. চন্দ্রাপ্পন। তিনি বলেন, "If there is no hope of recovery for a patient, it is only humane to allow him to put an end to his pain and agnoy in a dignified manner." যদিও বিতর্ক এবং বিরোধিতার শেষ নেই এখনই; পরেও এটা নিয়ে বির্তকের ঝড় উঠবে বিভিন্ন মহল থেকে ধর্মীয় এবং আইনি, তবু বলবো এই বিল আসাটা খুব আশাজনক।

বির্তক চলুক, নতুন নতুন প্রশ্ন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আসুক। উত্তর আছে সবেরই। মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই সঠিক উত্তর বেরোনো সম্ভব। সঠিক উত্তরের সূত্র ধরেই আইন পাল্টাবে একদিন। সারা পৃথিবী জুড়ে তাই 'স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার'—যার আরেক নাম হোক 'সুস্থ জীবনের অধিকার' আইনি হোক।

অধার্মিকের ধর্মকথন

অভিজিৎ রায়

পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল!—মূর্খরা সব শোনো,

মানুষ এনেছে গ্রন্থ;— গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।

—কাজী নজরুল ইসলাম (মানুষ, সাম্যবাদী)

ছোটবেলায় এক ভদ্রলোকের বাসায় যেতাম। জ্ঞানী-গুণী কিন্তু রসিক মানুষ; পেশায় অধ্যাপক। আমার সাথে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুব আগ্রহভরে আলোচনা করতেন। তাঁর বাড়ির নাম ছিল 'সংশয়'। আমি একদিন না পেরে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম, 'সংশয়' কেন? তিনি উত্তরে হেসে বললেন—"অভি, সংশয়ই হচ্ছে সকল জ্ঞানের উৎস। মানুষ চোখ-কান বন্ধ করে যে যা বলেছে তা বিশ্বাস না করে সংশয় প্রকাশ করেছে বলেই আমাদের সভ্যতা আজ এতদূর এগিয়েছে।" সত্যই তাই। ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। টলেমির 'পৃথিবীকেন্দ্রিক' মতবাদে কোপার্নিকাস আর গ্যালেলিওরা সংশয় প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই টলেমির মতবাদ একসময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা একসময় 'ইথার' নামক কাল্পনিক মাধ্যমটির অস্থিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বলেই পরবর্তীতে হাইগেনের তরঙ্গ-তত্ত্ব আর ম্যাক্সওয়েলের তড়িত-চুম্বকীয় তত্ত্বকে সরিয়ে আলোর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পদার্থবিজ্ঞানে জায়গা করে নিয়েছে প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন আর ব্রগলির তত্ত্বগুলো। হাটন আর লায়েলরা ৬০০০ বছরের পুরোনো পৃথিবীর বয়সের বাইবেলের বক্তব্যে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বলেই মিথ্যা বিশ্বাসকে সরাতে পেরেছিলেন মানুষের মন থেকে। এভাবেই সভ্যতা এগোয়। অনেকেই তর্ক করতে এসে নিজের বিশ্বাসের পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন না; তখন খুব ভক্তিতে গদগদ চিত্তে বলতে থাকেন বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া নিরক্ত বাক্যাবলি—"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর" অথবা "মানলে তাল গাছ আর না মানলে গাব গাছ"। এ যেন ডুবন্ত মানুষের শেষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে অনেকটা যুক্তিহীনভাবেই অন্ধবিশ্বাসের পক্ষে সাফাই গাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। কিন্তু যারা এ ধরনের বক্তব্য হাজির করেন তারা বোঝেন না যে, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু"—এ ধরনের ভাবনা নিয়ে বসে থাকলে আজও বোধ করি সূর্য পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরত! সভ্যতার অনিবার্য গতি আসলে বিশ্বাসের বিপরীতে, যুক্তির অভিমুখে; এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধের একটি চমৎকার উক্তি রয়েছে—"Doubt everything, and find your own light"। গৌতম বুদ্ধের উক্তিটি যেন আধুনিক যুক্তিবাদিদের সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গিরই এক সংগঠিত রূপ—যেটি আসলে বলছে, কোনো কিছুই বিনা প্রশ্নে মেনে নিও না।

সংশয় নিয়ে সামান্য কটি কথা খুব হাল্কাভাবে হলেও প্রথমেই সেরে নেওয়া হল একারণে যে, আজ আমরা সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব, ব্যবচ্ছেদ করে দেখব আমাদের সমাজের একটি বহুল প্রচলিত মিথ্যাকে—ছোটবেলা থেকেই আমাদের শিখিয়েছে—"ধর্ম পালন করা ছাড়া কখনই ভালমানুষ হওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া।"

<u>ধর্ম ও নৈতিকতার মিশ্রণ বনাম রূঢ় বাস্তবতা</u> :

প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আনুগত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকেই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করা হয়েছে। পশ্চিমাবিশ্বে গোড়া খ্রিস্টধর্মের অনুসারিরা সংগঠিত হয়ে অনেক আগে থেকেই মগজ-ধোলাই করতে শুরু করেছে এ কথা প্রচার করে যে, তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো আর তাদের ঈশ্বরই একমাত্র নৈতিকতা বিষয়ে শেষ কথা বলবার অধিকার রাখে। ধর্মগ্রন্থগুলোতে যেভাবে পথ দেখানো হয়েছে, সেগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করাই হল নৈতিকতা। আমাদের দেশি সংস্কৃতি তো আবার এগুলোতে সবসময়ই একধাপ এগিয়ে। অনেক বাসায় দেখেছি ছেলেবেলা থেকেই ছোট ছেলেমেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে দিয়ে বাংলা শেখার আগেই, বাসায় হুজুর রেখে আরবি পড়ানোর বন্দোবস্ত করানো হয়, নয়ত হরিকীর্তন শেখানো হয় আর নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে অন্তরে অন্তঃস্থ করানো হয়—"এই বাবু এগুলো করে না, আল্লাহ কিন্তু গুনাহ দিবে।" ছোটবেলা থেকে এইভাবে 'নৈতিকতার সাথে ধর্মের খিচুড়ি'—একসাথে মিশিয়ে এমনভাবে ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো হয় যে তারা বড় হয়েও আর ভাবতেই পারে না যে ধর্ম মানা ছাড়াও কারো পক্ষে ভালমানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্র গঠনের কোনো বাস্তব

যোগাযোগ আছে? নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, কৃষ্ণলীলা, তবলিগ জামাত ইত্যাদির মাধ্যমে গণমানুষের নৈতিকতা উন্নয়নের যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের নামে মারামারি, হানাহানি, হিংসা, শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র আর সন্ত্রাসের বিস্তার দেখে বোঝা যায় যে, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস'—আসলে কোনো বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষের মধ্যে কখনোই কাজ করেনি। কারণটা অতি পরিস্কার। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে 'নৈতিকতা' (Morality) অর্জনের চেষ্টা করা আসলে সোজা পথে ভাত না গিলে কানের চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার মতন। প্রত্যেক ধর্মই বলছে বিধাতা ভাল মানুষকে পুরস্কৃত করেন আর পাপী-নীতিহীনদের শাস্তি দেন। বোঝাই যায় পুরস্কারের লোভটাই এখানে মুখ্য। নৈতিকতা বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো উপায়ে আল্লাহকে তুষ্ট করে পুরস্কার বগলদাবা করতে পারলে কোনো বান্দাই আর নৈতিকতার ধার ধারবে না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, রাম-নাম, হরিবোল, পাঁঠা বলি, কোরবানি, নামাজ, হজ, কোরান তেলায়ত, পূজা, যজ্ঞ এই ব্যাপারগুলোর মাধ্যমে মানুষ আসলে নৈতিকতার কোন ধার না ধেরে বিধাতার তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টাতেই মত্ত। মানুষের প্রতি আর সমাজের প্রতি যাদের অবজ্ঞা আর প্রবঞ্চনা বেশি, তারাই কিন্তু বেশি 'আল্লাহ-আল্লাহ' করে চিৎকার দেয়। কারণ ধর্মেই রয়েছে সমস্ত অকাজ, কুকাজ করেও পার পাবার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারাণসী, তিরুপতি—এসব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পরকালে স্বর্গবাসী হওয়ার নিশ্চিৎ গ্যারান্টি। কোটিটাকার চোরাকারবারী তাই ধুমধাম করে পূজা-যজ্ঞ করে নয়ত শেষ বয়সে এলাকায় মন্দির গড়ে দেয় 'সমাজের ভালোর জন্য'। উপরন্তু, যুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজসচেতন মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে, ঈশ্বর এক অর্থহীন অলীক কল্পনা মাত্র। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায়—"অজ্ঞানতার অপর নামই হল ঈশ্বর"। কাজেই অজ্ঞানতাকে পুঁজি করে ঈশ্বর নামক মিথ্যা-বিশ্বাসের মূলা ঝুলিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের কাহিনী আজ অনেকের কাছেই 'শিশুতোষ ছড়া' ছাড়া আর কিছু নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'Why I am not a christian' গ্রন্থে বলেন (১):— "ধর্ম সম্পর্কে দু'ধরনের আপত্তি করা যায়—বৌদ্ধিক এবং নৈতিক। বৌদ্ধিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় যে, কোনো ধর্মকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই এবং নৈতিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় ধর্মের উপদেশগুলো এমন সময় থেকে উঠে এসেছিল যখন মানুষ বর্তমান যুগের থেকেও অনেক নিষ্ঠুর ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে এই উপদেশগুলি অমানবিকতাকে চিরন্তন করবার জন্যই তৈরি। যদি এই চিরন্তন ব্যাপারটি গ্রহণে মানুষকে বাধ্য না করা হত, তবে মানুষের নৈতিক বিবেকবোধ বর্তমানে আরো উন্নত হত।"

আমি একবার এক ওয়েব-সাইটের জন্য ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যকার বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। লেখা শুরু করতে না করতেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক সেখানে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "শ্রী অভিজিৎ রায়দের মত ব্যক্তিবর্গ যুগ যুগ ধরে এসেছে এবং ভূত হয়ে চলে গেছে। এদের সম্পর্কে কোরানে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা অন্ধ ও বর্বর। এদের হৃদয়ে সীল মোহর এঁটে দেওয়া আছে। তারা কিছুই দেখতে পায় না এবং শুনতে পায় না। শুধু প্রাণীর মত হাম্বা হাম্বা রব তোলে।" কোরানে যদি সত্যই এমনটি বলা থাকে, (সত্যই কোরানে অবিশ্বাসীদের অন্ধ/বর্বর, এবং এদের হৃদয়ে সীলমোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে, তা বলা আছে; দেখুন ২:৭, ৪:১৫৫, ৭:১০০, ৭:১০১, ৯:৯৩, ১৬:১০৮, ৩০:৫৯, ৪৫:২৩ ইত্যাদি) তবে বলতেই হয় মহান সৃষ্টিকর্তার রুচিবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়! কেবল ধর্ম মানি না বলেই ভদ্রলোক আমায় 'অন্ধ' ও 'বর্বর' বলেছেন, আর প্রমাণস্বরূপ 'সাক্ষী গোপাল' মেনেছেন তার চির-আরাধ্য ওই ধর্মগ্রন্থকেই। শুধু যে কোরানেই অধার্মিকদের সম্বন্ধে এ ধরনের বিষেদগার করা হয়েছে তা ভাবলে ভুল হবে। শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিক প্রাচীনকালের নাস্তিক্যবাদী 'চার্বাক দর্শন'কে 'লোকায়াত' বা 'ইতর লোকের' দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতাটির কথা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে। এমনকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বলা হয়েছে—মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাকের নাম থেকেই নাকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। মহাভারতে আছে—"চার্বাক ছিল দুর্যোধনের বন্ধু এক দুরাত্মা রাক্ষস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জিতবার পর চার্বাক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাকের চালাকি ধরে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন।" বোঝাই যায়, প্রাচীন ভাববাদিরা এই নাস্তিক্যবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এমন ঘৃণ্য চরিত্রের রাক্ষসের সাথে দর্শনটিকে জুড়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মহাভারতের আরেকটি উদাহরণ দেখি:— এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মেরে দিল। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যা করার চিন্তা করল। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সঙ্কেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে তার পশুজীবনের নানা দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন অনেক জন্মের পূণ্যের ফল সম্বল করে এই মানব-জন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম এই মানব জীবন আর তাও আবার ব্রাহ্মণ! এমন জীবন পাওয়ার পরও কি কেউ আত্মহত্যা করে? কাজেই অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শিয়াল বলল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিল। কিন্তু সেই জন্মে সে চূড়ান্ত মূর্খের মত এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ শিয়াল জন্ম। চূড়ান্ত মূর্খের মত কাজটি কী? এবারেই কিন্তু বেরিয়ে এল নীতি কথা : —"আমি ছিলাম এক বেদ সমালোচক পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচারসভায়

ছিলাম তর্কবিদ্যার প্রবক্তা। যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কিনা পণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।" (শান্তিপর্ব ১৮০/৪৭-৪৯)

বৈদিক যুগেও যুক্তিবাদীদের সংশয়, অযাচিত প্রশ্ন আর অনর্থক তর্ক-বিতর্ক একটি 'ফ্যাকটর' হয়ে উঠেছিল। 'পণ্ডিত্যাভিমানী মুর্খ্য'—এধরনের লেবেল এঁটে দিয়ে বেদ-সমালোচকদের প্রতিহত করার প্রচেষ্টা তারই ইঙ্গিত বহন করে। আজকেও কি এ দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে? যে ভদ্রলোকটি আমাকে ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা করার জন্য 'অন্ধ' বা 'বর্বর' হিসেবে চিত্রিত করছেন, সে ধরনের লোকজনের কিন্তু আজো সমাজে অভাব নেই, 'নাস্তিক' শুনলেই তারা খ্যাঁক করে ওঠেন—"ও তুমি নাস্তিক! তবে তো তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার! তোমার তো চরিত্র বলে কিছু নেই"। এরা আসলে নাস্তিকদের মানুষ বলেই মনে করেন না, ভালো-মানুষ ভাবা তো অনেক পরের কথা। কিন্তু 'নাস্তিক' মানেই কি অনৈতিক, চরিত্রহীন, লম্পট গোছের কিছু? এরকম ভাবার মোটেই কোনো কারণ নেই। নাস্তিকরা আসলে নাকের সামনে থেকে 'ঈশ্বর' নামক মূলাটি সরিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে নৈতিকতাকে দেখবার পক্ষপাতি; ঈশ্বরের ভয়ে নয়, একটি সুন্দর এবং সুস্থ সমাজ গড়ে তুলবার প্রয়োজনেই মানুষের চুরি, লাম্পট্য, খুন, ধর্ষণ বিসর্জন দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধগুলি গড়ে তোলা দরকার। নয়ত সমাজের ভিত্তিমূলই যে একসময় ধ্বসে পড়বে! কাজেই অধার্মিকদের চোখে 'নৈতিকতা' বেহেশ্‌তে যাওয়ার কোনো পাসপোর্ট নয়, বরং নিতান্তই সামাজিক আবশ্যকতা। ধর্মান্ধরা যেহেতু সামাজিক-মূল্যবোধের এই বিষয়গুলো একেবারেই বুঝতে চান না, তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ, দাঙ্গা, জিহাদ, মারামারি লেগেই আছে। ১৯৭১ সালের কথাই ধরা যাক; সারা বাংলা হতবিহ্বল হয়ে দেখেছে কিছু ধর্মান্ধ মানুষ ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে কী করে পশুর স্তরে নেমে যেতে পারে। আমি এক ভদ্রলোককে চিনতাম; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সাতে-পাঁচে নেই; সাদা চোখে দেখলে নিতান্ত ভালমানুষ বলেই মনে হবে। কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানেন যে একাত্তরে ভদ্রলোক এহেন দুষ্কর্ম নেই যে করেননি। সে সময় এমনকি তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন এই বলে যে, পাকসেনারা যদি কোনো বাঙালি মেয়েকে ধর্ষণ করে তবে সেটি অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না, বঙ্গনারীরা পাকবাহিনীর জন্য 'মালে গনিমত', কারণ পাকিস্তানিরা ইসলামের জন্য লড়ছে! এমন নয় যে ভদ্রলোক অশিক্ষিত ছিলেন, অথবা ছিলেন বুদ্ধিহীন। বরং সৎ এবং হৃদয়বান হিসেবেই একটা সময় তার খ্যাতি ছিল; কিন্ত এই 'সজ্জন' ব্যক্তিও স্রেফ ধর্মের প্রতি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে নেমে গেলেন পশুর স্তরে। তিনি ভেবেছিলেন পাকিস্তান ভেঙে গেলে ইসলাম হবে বিপন্ন। তাই ধর্ম বাঁচাতে যা যা করা দরকার সবই করেছেন। এমনকি খানসেনাদের সাথে পাল্লা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও আছে। ব্যাপারটি অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও অতিমাত্রায় ধর্মপ্রবণদের জন্য এ ধরনের কাজ খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময়ই মানবিকতার চেয়ে তাদের কাছে ধর্মবোধটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই ভদ্রলোকের কথা ভাবলেই নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ভাইনবার্গের বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায়: "ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভাল মানুষেরা ভাল কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভাল মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।" শুধু একাত্তর তো কেবল নয়, বছর কয়েক আগে ভারতের গুজরাটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দাঙ্গা, আর তারও আগে ১৯৯২ সালে অযোদ্ধায় বাবরি মসজিদ ভেঙে শিবসেনাদের তাণ্ডবনৃত্য ধর্মের এই ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করে দেয়। অপরপক্ষে নাস্তিকদের যেহেতু এই অতিমানবিকসত্তাকেন্দ্রিক নৈতিকতায় কোনো বিশ্বাস নেই, একজন নিষ্ঠাবান নাস্তিক সত্যিকার অর্থে গড়ে ওঠেন একজন যথার্থ প্রথা-বিরোধী মানুষ হিসেবে। সুমন তুরহান নামে একজন লেখক কলকাতার 'মাসিক দেশ' পত্রিকায় 'নাস্তি কতার সংজ্ঞা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"নাস্তিকদের অবিশ্বাস তাই শুধু অতিমানবিকসত্তায় নয়, তারচেয়ে অনেক গভীরে, তিনি অবিশ্বাস করেন প্রথাগত সভ্যতায় প্রায় সমস্ত অপবিশ্বাসে। সব কিছুই তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে চান।"(২) এর মধ্যে যে কিছুটা হলেও সত্যতা নেই, তা নয়। তবে ভালমানুষ হোন, আর নাই হোন এটা ঠিক যে নাস্তিক বা অধার্মিকদের মধ্যে কখনোই আলকায়েদা, তালিবান, হরকাতুলজেহাদ, রাজাকার, আলবদর, শিবসেনা, বজরংদলের মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিকরূপ দেখা যায় না। যতদিন ধর্ম থাকবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবে ধর্মের সাম্প্রদায়িক এই সাংগঠনিকরূপটিও কিন্তু বজায় থাকবে পুরোমাত্রায়। কাজেই যতদিন মানুষের আনুগত্য ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন তা মানুষকে স্বাধীনভাবে আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জনে বাধা দিবেই। বেহেশতের লোভে বা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য নয়, মানুষকে ভালবেসে মানুষের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তবেই গড়ে ওঠবে সর্বজনীন মানবতাবাদ। সম্প্রতি এর প্রচেষ্টা শুরুও হয়েছে। ঈশ্বরকেন্দ্রিক মিথ্যার বেসাতি মন থেকে সরিয়ে শুধু মানুষের জন্য মানুষের কাজ করার বাসনা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে নতুন শতকের আধুনিক মতবাদ হিসেবে এসেছে 'হিউম্যানিজম'। আমাদের পাশের দেশ ভারতে প্রবীর ঘোষ এবং সুমিত্রা পদ্মনাভনের নেতৃত্বে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' এবং 'ভারতীয় মানবতাবাদী সমিতি' অফিস-আদালতের ফর্মে বা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে 'হিন্দু', 'মুসলিম' শব্দগুলির পাশাপাশি ধর্মের জায়গায় 'মনুষ্যত্ব' শব্দটি ব্যবহারের আইনি অধিকার আদায় করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষের একটি চমৎকার উক্তি তাঁর গ্রন্থ থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি (৩): "আগুনের ধর্ম যেমন দহন, ছুরির ধর্ম যেমন তীক্ষ্ণতা, তেমনি মানুষের

ধর্ম হওয়া উচিত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। আর সে হিসেবে নামাজ না পড়েও বা শনি-শীতলার পূজা না করেও আমরা যুক্তিবাদী নাস্তিকেরাই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ আমরা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ চাই।"

ধর্মগ্রন্থগুলো কি সত্যিই নৈতিকতার ধারক এবং বাহক :

ধর্ম হল বিষবৃক্ষ, আর মৌলবাদ হল সে বৃক্ষের বিষাক্ত একটি শাখা। ইদানীং এক নতুন ধরনের প্রগতিবাদী (নাকি সুবিধাবাদী) আন্দোলন শুরু হয়েছে, যার মূলমন্ত্র হল ধর্ম নয়, কেবল মৌলবাদকে আঘাত কর। অনেক মুক্তমনা-যুক্তিবাদিদের দেখছি—বুঝে হোক, না-বুঝে হোক এ প্রচারণায় গা ভাসিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মতই সোচ্চারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছেন—"শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও মৌলবাদ রুখব", যেন মৌলবাদ ব্যাপারটি হঠাৎ করেই আকাশ থেকে আবির্ভূত হয়েছে মহীরূহ আকারে, কোনো শিকড় ছাড়াই। যারা ধর্মকে শ্বাশ্বত চিরন্তন আর জনকল্যাণমূলক বলে মনে করেন আর যত দোষ চাপাতে চান কেবল গোলাম আজম, আদভানি কিংবা 'মৌলবাদ' নামক নন্দঘোষটির ঘাড়ে, তাদের প্রথমে খোদ 'মৌলবাদ' শব্দটিকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে বলি। 'মৌল' শব্দের অর্থ মূল থেকে আগত, বা 'মূল সম্বন্ধীয়'; আর 'বাদ' শব্দের অর্থ যে 'মত', 'তত্ত্ব' বা থিওরি, তা তো আমরা জানিই। তা হলে মৌলবাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কী দাঁড়ালো—'মূল থেকে আগত তত্ত্ব'। কোন মূল থেকে আগত তত্ত্ব? শেষ পর্যন্ত ওই ধর্মগ্রন্থের গোড়া মূলনীতিগুলো হতে আগত তত্ত্ব। কাজেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিন্তু থলের বিড়াল ঠিকই বেরিয়ে পড়ছে যে, ধর্মশাস্ত্রের মূলনীতিগুলোকে চরম সত্য বলে যারা মনে করেন, তারাই শেষ পর্যন্ত মৌলবাদী হন। মৌলবাদ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Fundamentalism'; সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারি শব্দটি সম্পর্ককে বলছে: Strict maintainance of traditional scriptural beliefs; চ্যাম্বার্স ডিকশনারি শব্দটি সম্পর্কে বলছে: Belief in literal truth in Bible, against evolution etc। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে মৌলবাদ রুখবার চেষ্টা অনেকটা বিষবৃক্ষের গোড়ায় পানি ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে রেখে আগায় কাঁচি চালানোর প্রচেষ্টা, নিছক ভণ্ডামি। তসলিমা নাসরিন একবার একটি ইংরেজি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন (৪): "আমি সাধারণভাবে মৌলবাদিদের আর সেই সাথে ধর্মের—দু-এরই সমালোচনা করেছিলাম। আমি আসলে ইসলামের সাথে ইসলামি মৌলবাদের কোনো তফাৎ দেখি না। আমি মনে করি ধর্মই হচ্ছে মূল উৎস, যা থেকে মৌলবাদ নামক বিষাক্ত ডালপালাগুলো সময়-সময় বিস্তার লাভ করে। যদি আমরা ধর্মকে অক্ষত রেখে দেই, কেবল মৌলবাদ নামক একটি ডালকে ছেঁটে ফেলতে সচেষ্ট হই, দেখা যাবে কিছুদিন পর মৌলবাদের আরেকটা শাখা অচিরেই বেড়ে উঠেছে। আমি খুব পরিস্কারভাবেই এটি বলছি কারণ কিছু উদারপন্থী লোকজন আছেন যারা এ ধরনের প্রশ্নে ইসলামকে ডিফেন্ড করেন আর সমস্ত সমস্যার জন্য কেবল মৌলবাদিদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হন। কিন্তু ইসলাম নিজেই তো নারী-নির্যাতনকারী। ইসলাম নিজেই তো গণতন্ত্র সমর্থন করে না আর সমস্ত মানবিক অধিকার হরণ করে।" আমার এক পরিচিত 'সেক্যুলার এবং প্রগতিশীল' দাবিদার; কিন্তু তসলিমার এই সাক্ষাৎকার পড়ে যেন পিত্তি জ্বলে গেল! তসলিমা 'শ্যালো', তসলিমা 'নির্বোধ', কী নন তিনি! বুঝলাম, তসলিমার বড় অপরাধ তিনি ধর্ম আর মৌলবাদকে এক করে ফেলেছেন। কিন্তু তসলিমা ভুল করেছেন না ঠিক বলছেন সেটি বিশ্লেষণ করতে হলে নির্মোহ সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকানো দরকার। আসুন প্রিয় পাঠক, আমরা যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখি ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে মৌলবাদের সত্যই কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কী-না, এবং ধর্মগ্রন্থগুলো আদৌ 'নৈতিকতার ভাণ্ডার' হিসেবে পরিচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে কি-না?

পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে বড়জোর বিগত ২-৪ হাজার বছরের মধ্যে। হিন্দু, ইসলাম কিংবা খ্রিস্ট ধর্ম কোনোটাই সে অর্থে চিরন্তন বা সনাতন নয়। কাজেই 'সনাতন ধর্ম' নিছকই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। তবে সনাতন না হলেও ধর্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু কিন্তু হয়েছিল বহু হাজার বছর আগে। বিরূপ প্রকৃতির নানা দুর্যোগ-দাবানল, প্লাবন, বজ্রপাত প্রভৃতির ব্যাখ্যা খুঁজতে অসহায় হয়ে আর ওগুলোর হাত থেকে মুক্তি খুঁজতে মানুষ সৃষ্টি করেছিলো নানা দেবদেবীর; মৃত্যুকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করতে পেরে সৃষ্টি করেছিল অদৃশ্য আত্মার। যারা সমাজবিজ্ঞান-নৃবিজ্ঞান নিয়ে সামান্য পড়াশুনা করেছেন তারা এগুলো ভাল জানেন। আর এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, মানুষের মধ্যে তথাকথিত 'ধর্মবিশ্বাসের' সৃষ্টি হয়েছিল এখনকার মানুষের পূর্বসূরি নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আমলে—যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি (৫)। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাসগুলো ছিল একেবারেই আদিম—আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় একেবারেই আলাদা। এখন থেকে ৪০-১৮ হাজার বছর আগে উচ্চতর পূর্বপ্রস্তরযুগে এসে আত্মা, পরমাত্মা, ধর্মীয় আচার আর যাদুবিদ্যাসংক্রান্ত ব্যাপারগুলো সুসংহত হয়। আজকের দিনের ধর্মবিশ্বাসগুলোর মধ্যে বৈদিক ধর্মের (হিন্দুধর্মের পূর্বসূরি) উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে মাত্র ৩৫০০ বছর আগে, ইসলামধর্ম এসেছে ১৪০০ বছর আগে, খ্রিস্টধর্ম ২০০০ বছর আগে। একটা সময় সামাজিক প্রয়োজনে যে ধর্মীয় রীতি-নীতি নিয়ম-কানুন তৈরি হয়েছিল আজ তার অনেককিছুই কালের পরিক্রমায় স্থবির, পশ্চাৎপদ, নির্বতনমূলক এবং অমানবিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পবিত্র গ্রন্থগুলোর বেশ অনেকটা জুড়েই রয়েছে উত্তেজক নির্দেশাবলীর ছড়াছড়ি, যেগুলো 'মৌলবাদের সুতিকাগার' হিসেবে আজ কারো মনে হতেই পারে। প্রমাণ লাগবে নিশ্চয়ই? ঠিক আছে প্রথমে দেখি ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরানশরিফ (৬):—

কোরানে রয়েছে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাবে তাদের হত্যা করতে (২:১৯১, ৯:৫), তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার করতে (৯:১২৩), যুদ্ধ করে যেতে (৮:৬৫), বিধর্মীদের অপদস্থ করতে, তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (৯:২৯)। অন্য সকল ধর্মের অনুসারিদের কাছ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকু কেড়ে নিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করেছে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম (৩:৮৫)। এটি অবিশ্বাসীদের দোজখে নির্বাসিত করে (৫:১০) এবং অপবিত্র বলে সম্বোধন করে (৯:২৮); মুসলিমদের ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকল ধর্মকে সরিয়ে ইসলামি রাজত্ব কায়েম হয় (২:১৯৩)। শুধু ইসলামে অবিশ্বাসের কারণেই একটি মানুষ দোজখের আগুনে পুড়বে আর তাকে সেখানে পান করতে হবে দুর্গন্ধময় পুঁজ (১৪:১৬-১৭)। অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে অথবা তাদের হাত-পা কেটে ফেলতে প্ররোচিত করছে, দেশ থেকে অপমান করে বের করে দিতে বলছে (৫:৩৩)। যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর পেটে যা আছে তা গলে যায়, আর ওদের পেটানোর জন্য থাকবে লোহার মুগুর (২২:১৯-২১)। ইহুদি এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু পর্যন্ত করতে নিষেধ করেছে (৫:৫১); এমন কী নিজের পিতা বা ভাই যদি অবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে (৯:২৩, ৩:২৮)। আল্লাহ কোরানে পরিস্কার করেই বলেছেন আল্লাহ-রসুলে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড (৪৮:১৩)। ইসলামে অবিশ্বাস করে কেউ মারা গেলে কঠোরভাবে উচ্চারিত হবে—"ধর ওকে, গলায় বেড়ি পড়াও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে আর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তুর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে" (৬৯:৩০-৩৩)। আল্লাহর নামে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে এই বলে যে—"এটা তোমাদের জন্য ভালোই, এমনকি যদি তোমাদের অপছন্দ হয় তবুও" (২:২১৬); উপদেশ রয়েছে—"কাফেরদের গর্দানে আঘাত করো" (৪৭:৪)। পরম করুণাময় এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, "কাফেরদের হৃদয়ে আমি গভীর ভীতির সঞ্চার করব" এবং বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কাফেরদের ঘাড়ে ও সারা অঙ্গে আঘাত করতে (৮:১২)। আল্লাহ জেহাদকে মুমিনদের জন্য 'আবশ্যিক' (mandatory) করেছেন আর সর্তক করেছেন এই বলে—"তোমরা যদি সামনে না এগিয়ে আস (জেহাদের জন্য), তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তদ শাস্তি' (৯:৩৯)। আল্লাহ বলেছেন—"হে নবি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর আর কঠোর হও, কেননা জাহান্নামের মত নিকৃষ্ট আবাসস্থলই তাদের পরিণাম (৯:৭৩)।

হাদিসসহ ইসলামি অন্যান্য গ্রন্থের কথা না হয় বাদই থাকুক আপাতত। এখন, যারা নিজস্ব বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থকে নির্দ্বিধায় 'The way of life' অথবা 'The book of guidence' বলে মেনে নেন, তারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন উপরের আয়াতগুলো কেউ যদি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে আর সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগ চায়, তবে কী হবে? জেহাদিদের 'কল্যাণে' আজকের বিশ্বে 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদ' একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ। প্রতিদিন কাগজের পাতা খুললেই দেখা যায় জেহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ কিছু লোক বোমা মারছে মানুষজন, বাড়ি, কারখানা, রাস্তাঘাট, যানবাহন, সিনেমা হল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা সমুদ্র-সৈকতে। এইতো ১৭ আগষ্ট (২০০৫) সারা বাংলাদেশে ৬৩টি জেলায় একসঙ্গে বোমার মহড়া হয়ে গেলো। বোমা হামলার স্থান থেকে পাওয়া লিফলেট জুড়েই ছিল কোরান-হাদিস থেকে নানা উদ্ধৃতি আর কাফের-নাফরমানদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক। সচেতন শান্তিকামী ধার্মিক মানুষদের আজ আত্মোপলব্ধির সময় এসেছে, সময় এসেছে সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করার, কেন জেহাদি সংগঠনগুলো সন্ত্রাসী আচরণ করছে? কে ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে? এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো কী শেখাচ্ছে আমাদের?—সেই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি দীর্ঘদিনের বিদ্বেষমূলক পররাষ্ট্রনীতির কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না (৭)। জনবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আলকায়েদার কোনো সম্পর্ক না খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জভাবে ইরাকের ওপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা শুধু আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে তা নয়, ইসলামি-বিশ্ব এই আগ্রাসনকে যে কোনো কারণেই হোক ইসলামের উপর আঘাত হিসেবেই নিয়েছে। সে জন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সে সমস্ত দেশেই ইসলামি আত্মঘাতী বোমা হামলার মাত্রাটা বেশি যে দেশের সরকার ইরাক যুদ্ধে বুশ-ব্লেয়ারকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে। এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আর প্রতিহিংসার ব্যাপারগুলো ভুলে গেলে কোনো আলোচনাই কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করাও বোধহয় এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—রাষ্ট্রযন্ত্র কীভাবে ধর্ম ও মৌলবাদকে লালন-পালন করে আর সময় বিশেষে উস্কে দেয় তার একটি বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিজ্ঞানীরা স্টেমসেল নিয়ে গবেষণা করবে কি করবে না, কৃত্রিমভাবে সংযুক্ত জীবনরক্ষাকারী যন্ত্র তুলে ফেলা হবে কি হবে না, স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়ানো হবে কি হবে না, আর হলে কিভাবে পড়তে হবে, সবকিছুই সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে মার্কিন সরকার। বিজ্ঞানীদের গবেষণা আর কাজকর্ম নৈতিক না অনৈতিক—এ নিয়ে উপযাজক হয়ে জ্ঞানগর্ভ মত দিতে এগিয়ে আসছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত অর্ধশিক্ষিত পাদ্রি আর যাজকেরা। যুদ্ধের আগে নবি-রসুলদের মতই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে সে দেশের প্রেসিডেন্ট; মিডিয়া, বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী আর প্রকাশক নির্ধারণ করে দিচ্ছে কোন খবরে আমরা বিশ্বাস করব, আর কোন খবর চেপে যাওয়া হবে। আসলে 'মুক্ত বিশ্বের' কথা মুখে বলে এভাবেই নাগরিক রুচি, চাহিদা, চেতনা আর পুরো জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে মার্কিন ধর্মান্ধ-শাষককূল আর ধনকুবের গোষ্ঠী; সে অন্য এক ইতিহাস।

ধর্ম, মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার একটা বড় সমস্যা হল অযাচিত স্টেরিওটাইপিং-এর ভয়। এ ধরনের আলোচনা শুরু হলেই দেখেছি বিশ্বাসীদের অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে থাকেন—শুধু গুটিকয়েক সন্ত্রাসীদের কারণে সামগ্রিকভাবে ইসলামকে বা মুসলিমদের দায়ী করাটা কী ঠিক হচ্ছে? একজন বিন লাদেন বা একজন মুফতি হান্নান কী ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে নাকি? না,

সত্যই করে না। কাজেই আমিও বলি, পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কখনোই সন্ত্রাসী বলা উচিত নয়, বলা যায় না। যারা এ ধরনের স্টেরিওটাইপিং করতে চান তারা ভুল করেন। এটি এক ধরনের Racism (বর্ণবাদ)। কেউবা বলেন এটি এক ধরনের রোগ 'ইসলামোফোবিয়া'! রোগই বলুন আর পশ্চিমা জাত্যাভিমানই বলুন (যাকে প্রয়াত মনীষী এডয়ার্ড সাইদ অভিহিত করেন 'ওরিয়ান্টালিজম' নামে), ৯/১১-এর পর পশ্চিমাবিশ্বে বসবাসরত মুসলিমরা যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই—এ তো অস্বীকার করবার জো নেই। মুসলিম মানেই যে সন্ত্রাসী নয়, এটি বোঝানোর জন্য তো কোনো দর্শন কপচানোর দরকার নেই, আমার-আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তো যথেষ্ট হবার কথা। আমার নিজেরই অনেক মুসলিম বন্ধুবান্ধব রয়েছে। তাঁদের কেউই তো সন্ত্রাসী নন, কেউই বিন লাদেন নন, কেউই নন মুফতি হান্নান। তাঁরা আমার বিপদে-আপদে খোঁজ-খবর নেন, বাসায় এসে গল্পগুজব করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, এমনকি নামাজের সময় এলে এই 'কাফেরের বাসার' পশ্চিমদিক কোনটা জানতে চেয়ে নামাজও পড়েন। এরা নিপাট ভালো মানুষ। তাঁরা কোরানের কোন আয়াতে ভায়োলেন্সের কথা আছে তা সম্বন্ধে মোটেও ওয়াকিবহাল নন, সেটা নিয়ে আগ্রহীও নন—তারা আসলে 'Spiritual Islam'এর চর্চা করেন। বিপদটা কখনোই এদের নিয়ে নয়। এরা সবাই শান্তি, ভালোবাসা আর সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মূল্যবোধ তারা যতটা না ইসলাম থেকে পেয়েছেন, তারচেয়ে অনেক বেশি ছোটবেলা থেকেই সামাজিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কোনোদিন কোরানের বা ইসলামের চর্চা না করেও তো বহু মানুষ এই গুণাবলী বর্জিত নয়, এমন প্রমাণ ভূরি-ভূরি হাজির করা যায়। কিন্তু এই 'Spiritual Islam'-এর চর্চাকারী দলের বাইরে একটা অংশ রয়েছেন যারা চোখ-কান বন্ধ করে ধর্মের সকল আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন আর এর আলোকে দেশ ও পৃথিবী গড়তে চান। বিপদটা এদের নিয়েই। কারণ কেউ যদি সামাজিকশিক্ষার বদলে ধর্মের সকল আদেশ-নির্দেশ চোখ-কান বন্ধ রেখেই মেনে নেন তাহলে কী হবে? উদাহরণ হিসেবে পাশের আয়াতটিতে (৩:২৮) চোখ বুলানো যাক, "বিশ্বাসীরা যেন বিশ্বাসীদের ছাড়া অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধু কিংবা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ না করে। যে-কেউ এমন করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।..."। (এবং ২:২১৬ ও ৪:৮৪ আয়াতদুটি দেখুন।) যারা পবিত্র কোরানের আলোকে জীবন সাজাতে চান, তারা নিজেরাই কী তাদের কোনো হিন্দু, খ্রিস্টান বা অধার্মিক প্রতিবেশীদের প্রতি কোরানের বর্ণিত উপরের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করেন? তারা কি সত্যই শুধুমাত্র অমুসলিম বলে কারো বন্ধুত্ব প্রত্যাখান করেন? যদি তা না হয়, তবে বলতেই হয় তারা আসলে কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী চলছেন না। যদি কেউ ভাসা-ভাসা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোরানের চর্চা না করে কোরানের সকল নির্দেশ আক্ষরিকভাবেই মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেন আর অবশেষে 'তালিবান' হিসেবে গড়ে ওঠেন, তবে দোষটা কার হবে? আমি আর ইসলাম বা কোরান নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না। পাঠক, আপনারাই প্রশ্ন করুন, সিদ্ধান্ত নিন যুক্তি প্রয়োগ করে।

এবার হিন্দু ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা যাক। হিন্দু ধর্মকে ইসলাম থেকে কোনো অর্থেই ভালো বলবার জো নেই। যে জাতিভেদ প্রথার বিষবাষ্প প্রায় তিনহাজার বছর ধরে ভারতকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তার প্রধান রূপকার স্বয়ং ঈশ্বর। মনুসংহিতা থেকে আমরা পাই—মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শূদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১:৩১)। হিন্দুবিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে আর শূদ্রদের পা থেকে তৈরি করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি কিন্তু বড়ই মহান! মনু বলেছেন, "নাভির উর্ধ্বভাগে পুরুষ পবিত্র বলে কথিত, তার অপেক্ষা এর মুখ পবিত্রতম বলে ব্রহ্মা বলেছেন" (১:৯২, ৫:১৩২)। শূদ্র আর দলিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাই ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট উঁচুজাতের ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। হিন্দু ধনীর বাসায় দাস হিসেবে এখনো নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। মনু বলেছেন—"দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শূদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন" (১:৯১, ৮:৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ নির্বাহ করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গাজল ছিটিয়ে গৃহকে পবিত্র করা হত (ক্ষেত্রবিশেষে এখনো হয়)। আর হবে নাইবা কেন? তারা আবার মানুষ নাকি? তারা তো অচ্ছুৎ! শ্রী এম. সি. রাজার কথায়—"আপনি বাড়িতে কুকুর বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মুত্র পান করতে পারেন, এমন কি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মাড়াতে পারবেন না।" এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা। এমনকি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শুদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তিও তাদের ভোগের অধিকার নেই—"সব উপার্জিত ধন দাস-মালিকেরাই নিঃশঙ্কভাবে গ্রহণ করবে, শূদ্রদাসের নিজস্ব কিছুই নেই" (১:১০০, ৮:৪১৭)। শূদ্ররা ছিলো বঞ্চনার করুণতম নির্দশন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিলো ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার! শূদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) হতে আলাদা করে চেনা যায় এবং শূদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে—বাকি তিন বর্ণের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করার জন্যই তাদের জন্ম; তিন বর্ণের থেকে শূদ্ররা ভিন্নতর জীব, মনুষ্যেতর জীব, তা জানার জন্যে শূদ্রদের প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন (৫:১৪০)। একজন শূদ্রকে বেদ পাঠ তো দূরের কথা, শ্রবণের অধিকারও দেয়া হয়নি (৪:৯৯); এমনকি একজন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসতে চায় তবে তার কটিদেশে গরম লোহার শলাক দ্বারা ছ্যাঁকা দিয়ে নির্বাসিত করতে হবে অথবা পশ্চাদ্দেশ কর্তন করা হবে (৮:২৮১)। মনুর এসব বর্ণবাদী নীতির বাস্তব রূপায়ন দেখতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতে। বিশেষতঃ ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসন যে শ্রেণিবৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং শূদ্রের দমন নিপীড়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত, তার

সবচেয়ে বড় উদাহরণ রামায়ণের 'শম্বুক বধ কাহিনী'। শূদ্র হয়ে 'তপস্যা করার অপরাধে' ভগবান রামচন্দ্র খড়গ দিয়ে শম্বুক নামক এক শূদ্র তাপসের শিরোচ্ছেদ করেন তার তথাকথিত রামরাজ্যে! (৮)

প্রায় একই ধরনের ঘটনা আমরা দেখি মহাভারতেও,—"নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এলে তাকে নিচজাতি (শূদ্র) বলে প্রত্যাখ্যান করেন দ্রোণ। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত একলব্যের দক্ষতা নষ্ট করে ধনুর্বিদ্যায় দ্রোণের প্রিয় ছাত্র অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রক্ষার অভিপ্রায়ে 'গুরুদক্ষিণা' হিসেবে একলব্যের বুড়ো আঙুল কেটে নেন তিনি"। এ ধরনের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে মহাকাব্যগুলিতে (৯)। আসলে এইসব প্রাতিষ্ঠানিক-ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের-সমাজ কাঠামোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিলে অসাম্যের সমাজ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজ। ধর্মই তৈরি করেছিলো হুজুর-মুজুর শ্রেণির কৃত্রিম বিভাজনের, কিংবা হয়ত বলা যায় শোষক-শ্রেণিই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ফায়দা পুরোপুরি লুটবার জন্য প্রথম থেকেই কাজে লাগিয়েছিলো ধর্মকে, যেভাবেই দেখি না কেন ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো সামাজিক-অর্থনৈতিক শোষণের জন্যে। এই শাসন-শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্যই ব্রাহ্মণেরা প্রচার করেছিলো ধর্মগ্রন্থগুলো ঈশ্বরের মুখ থেকে নিঃসৃত। মানুষে-মানুষে বিভেদ নাকি ঈশ্বর নির্দেশিত! ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার সুদূরপ্রসারী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উপমহাদেশের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে।

বিভিন্ন জেহাদি সৈনিকদের মতই ভারতে বিভেদের হাতিয়ার 'সনাতন ধর্ম' রক্ষায় আজ সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিব-সেনা, বজরংদলের মত চরম প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর ধর্মান্ধতার কারণে ভারতের আপামর জনসাধারণের কাছে সন্যাসী, গেরুয়া, জটা, দণ্ড, রুদ্রাক্ষ, কমণ্ডলু দীর্ঘকাল ধরে একটা বিমূঢ় সম্ভ্রম ভোগ করে এসেছে। ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহের কথা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা ভালো করেই জানে। তাই এই ধর্মীয় ভাবালুতাকে উস্কে দিতেই বোধহয় ১৯৮৮-৯০ সালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দূরদর্শনে ধর্মীয় অবয়বে প্রচারিত হলো রামায়ণ, মহাভারত। সরকারী প্রচারমাধ্যমে অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহ দেবার ফলেই কল্পিত 'রাম জন্মভূমি' নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার তৈরি হয়, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর (১৫২৮ সালে তৈরি) বাবরি মসজিদ ধ্বংস, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণহত্যার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর উত্থান একই প্রক্রিয়ারই অংশ। ২০০২ সালে আবার গুজরাটে ঘটে গেল স্মরণকালের সবচাইতে ভয়াবহ দাঙ্গা। ধর্মের মায়াজালে পড়ে মানুষ কী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠতে পারে, নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে, হাজার হাজার মানুষ নিমিষেই হত্যা করতে পারে—গুজরাটের সাম্প্রতিক দাঙ্গা তারই প্রমাণ। হায়! এরপরেও ধর্মের সমালোচনা করলে মৌলবাদিদের সাথে অনেক প্রগতিবাদী একাট্টা হয়ে বুক চিতিয়ে দাড়ান! কেন?

ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের পবিত্র গ্রন্থের দিকে তাকালে দেখা যায়, পুরো বাইবেলটিতে ঈশ্বরের নামে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। কিছু উদাহরণ তো দেয়া যেতেই পারে; কিন্তু পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না। যুদ্ধ জয়ের পর অগণিত যুদ্ধবন্দিকে কব্জা করার পর মুসা (মোশি) নির্দেশ দিয়েছিলেন ঈশ্বরের আদেশ হিসেবে সমস্ত বন্দি পুরুষকে মেরে ফেলতে (১০): "এখন তোমরা এইসব ছেলেদের এবং যারা অবিবাহিতা সতীমেয়ে নয় এমন সব স্ত্রীলোকদের হত্যা কর; কিন্তু যারা অবিবাহিতা সতীমেয়ে তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ।" (তৌরাত শরিফ, শুমারি, ৩১:১৭-১৮)। এক হিসাবে দেখা যায়, মুসার নির্দেশে প্রায় ১০০,০০০ জন তরুণ এবং প্রায় ৬৮,০০০ অসহায় নারীকে হত্যা করা হয়েছিলো (১১)। এছাড়া নিষ্ঠুর আক্রমণাত্মক এবং অরাজক বিভিন্ন ভার্সসমূহের বিবরণ পাওয়া যায়—ইশাইয়া (২১:৯-১০, ১৩:১৫-১৬), ১ খান্দাননামা (২০:৩), ২ খান্দাননামা (১৪:৯-১৫), শুমারি (১৬:৩২-৩৫, ২৫:৩-৪), কাজিগণ (৮:৭), দ্বিতীয় বিবরণ (১১:৪-৫, ১২:২৯-৩০), ১ শামুয়েল (১৫:২-৩), ২ শামুয়েল (১২:৩১) প্রভৃতি জায়গায়।

বিশ্বাসী খ্রিস্টানরা সাধারণত বাইবেলে বর্ণিত এই ধরনের অরাজকতাকে প্রত্যাখ্যান করে বলার চেষ্টা করেন, "এগুলো সব বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ) অধীন, যিশুখ্রিস্টের আগমনের সাথে সাথেই আগের সমস্ত অরাজকতা নির্মূল হয়ে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে"। এটি মোটেই সত্য নয়। বাইবেলের নতুন নিয়মে যিশু খুব পরিস্কার করেই বলেছেন যে তিনি পূর্বতন ধর্মপ্রবর্তকের নিয়মানুযায়ী চালিত হবেন; তিনি বলেন—"একথা মনে কর না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবিদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি বরং পূর্ণ করতে এসেছি" (মথি, ৫:১৭)। খ্রিস্টধর্মের অনুসারিরা যেভাবে যিশুকে শান্তি এবং প্রেমের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন সত্যিকারের যিশু ঠিক কতটুকু প্রেমময় এ নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ যিশু খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন: "আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে কর না। আমি শান্তি দিতে আসিনি বরং আমি এসেছি মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে দাঁড় করাতে এসেছি; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি" (মথি, ১০:৩৪-৩৫)। ব্যভিচার করার জন্য শুধু ব্যভিচারিণী নন, তার শিশু সন্তানদের হত্যা করতেও কার্পণ্য বোধ করেন না যিশু, বলেন—"সেইজন্য

আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব, আর যারা তার সঙ্গে জেনা করে তারা যদি জেনা থেকে মন না ফিরায় তবে তাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলব। তার ছেলেমেয়েদেরও আমি মেরে ফেলব...” (প্রকাশিত কালাম, ২:২২-২৩)।

ধর্মের সমালোচনা কেন? মানবতাবাদীরা আর যুক্তিবাদীরা কেন ধর্মগ্রন্থগুলোর সমালোচনা করেন? সমালোচনা করেন কারণ তা সমালোচনার যোগ্য, তাই। কোনো কিছুই আসলে সমালোচনার উর্দ্ধে নয়—তা সে অর্থনীতি বা পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোনো তত্ত্বই হোক, বা ‘ঈশ্বরের মহান বাণী’ই হোক। ধর্ম মানে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনা, কুসংস্কার আর রীতিনীতির সমাহার, যেগুলো কালের প্রয়োজনীয়তায় উপযোগিতা হারিয়েছে। ধর্মের সমালোচনার আরো একটি বড় কারণ হলো, ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। ধর্মগ্রন্থগুলোতে যা লিখা আছে তা ‘ঈশ্বরের বাণী’ হিসেবে পালন করা হয় আর উৎসাহের সাথে সমাজে তার প্রয়োগ ঘটানো হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত সতীদাহের মাহাত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শুধুমাত্র ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে শিকার হয়েছে ৮১৩৫ জন নারী। এই সেদিনও (১৯৮৭) রূপ কানোয়ার নামে একটি মেয়েকে পুড়িয়ে মারা হলো ‘সতী মাতা কি জয়’ ধ্বনি দিয়ে; কেউ টু শব্দটি করল না। আর করবেই বা কেন? ধর্ম রক্ষা করতে হবে না? ধর্ম যে কি রকম নেশায় বুদ করে রাখে মানুষকে, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই সতীদাহ। এজন্যই বোধহয় Pascal বলেছেন—“Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction”। খুবই সত্যি কথা। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই বেশ কিছু ভালো ভালো কথা আছে (এগুলো নিয়ে আমার বা কারোই আপত্তি করার কিছু নেই); এগুলো নিয়েই ধার্মিকেরা গর্ববোধ করেন আর এ কথাগুলোকেই নৈতিকতার চাবিকাঠি মনে করেন তারা। কিন্তু একটু সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যাবে—ভালোবাসা প্রেম এবং সহিষ্ণুতার বিভিন্ন উদাহরণ যে ধর্মগ্রন্থ এবং তাঁর প্রচারকদের সাথে লেবেল হিসেবে লাগিয়ে দেয়া হয়, সেগুলো কোনটাই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের জন্য মৌলিক নয়। যেমন বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যে সহনশীলতার কথা বলা আছে, সেগুলোর অনেক আগেই (খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে) চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস একইরকমভাবে বলেছিলেন “অন্যের প্রতি সেরকম ব্যবহার কর না, যা তুমি নিজে পেতে চাও না।” আইসোক্রেটস খ্রিস্টের জন্মের ৩৭৫ বছর আগে বলে গিয়েছিলেন, “অন্যের যে কাজে তুমি রাগান্বিত বোধ কর, তেমন কিছু তুমি অন্যদের সাথে কর না।” এমনকি শত্রুদের ভালোবাসতে বলার কথা তাওইজমে রয়েছে, কিংবা বুদ্ধের বাণীতে, সেও কিন্তু যিশু বা হজরত মোহাম্মদের জন্মের অনেক আগেই। কাজেই নৈতিকতার যে উপকরণগুলোকে ধর্মানুসারিরা তাদের স্ব-স্ব ধর্মের ‘পৈত্রিক সম্পত্তি’ বলে ভাবেন, সেগুলোর কোনটাই কিন্তু আসলে ধর্ম থেকে উদ্ভূত হয়নি, বরং বিকশিত হয়েছে সমাজ বিবর্তনের অবশ্যাম্ভাবী ফল হিসেবে। সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে ‘নৈতিক গুণাবলি’ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে; কারণ এভাবে গ্রহণ না করলে সমাজব্যবস্থা অচিরেই ধ্বংস হয়ে পড়ত। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সলোমন অ্যাশ বলেন, “আমরা এমন কোন সমাজব্যবস্থাকে জানি না যেখানে সাহসিকতাকে হেয় করা হয়, আর ভীরুতাকে সম্মানিত করা হয়; কিংবা উদারতাকে পাপ হিসেবে দেখা হয় আর অকৃতজ্ঞতাকে দেখা হয় গুণ হিসেবে।” এমন ধরনের সমাজের কথা আমরা জানি না, কারণ এমন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। খুব সাদা চোখে দেখলেও একটি সমাজে চুরি করা যে অন্যায়, এটি বোঝাবার জন্য কোন স্বর্গীয় ওহি নাজিল হওয়ার দরকার পড়ে না। কারণ যে সমাজে চুরি করাকে না ঠেকিয়ে মহিমান্বিত করা হবে, সে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাবে অচিরেই। ঠিক একইভাবে আমরা বুঝি, “সত্যি কথা বলার বদলে যদি মিথ্যা বলাকে উৎসাহিত করা হয়, তবে মানুষে মানুষে যোগাযোগ রক্ষা করাই দূরহ হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারগুলো উপলব্ধির জন্য কোনো ধর্মশিক্ষা লাগে না।” আবার এমনও দেখা গেছে যে, শতাব্দী প্রাচীন কোনো চলমান ব্যবস্থার পরিবর্তন মানুষ নিজে থেকেই করেছে পরিবর্তিত মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে মানবতাকে যাচাই করে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম কী বলছে তার তোয়াক্কা না করেই; যেমন, দাস প্রথার উচ্ছেদ। বলাবাহুল্য, কোনো ধর্মগ্রন্থেই দাসত্ব উচ্ছেদের আহ্বান জানানো হয়নি। বাইবেলের পুরাতন-নতুন নিয়ম, কোরান অথবা বেদ-উপনিষদ-মনুসংহিতা—কোথাও এই দাসত্ব প্রথাকে নির্মূল করার কথা বলা হয়নি, বরং সংরক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে প্রকারান্তরে। কিন্তু মানুষ সামাজিক প্রয়োজনেই একটা সময় দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করেছে, যেমনিভাবে হিন্দুসমাজ করেছে সতীদাহ নির্মূল, খ্রিস্টসমাজ করেছে ডাইনি পোড়ানো বন্ধ। সতীত্ব কিংবা গর্ভপাতের অধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সারা পৃথিবী জুড়ে এই কয়েক দশকে। এ পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির অনেকগুলোই ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

<u>বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কিছু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান</u> :

আজ আধুনিক রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, ঈশ্বরের শাস্তির দোহাই দিয়ে মানুষজনকে সৎ পথে পরিচালিত করার ব্যাপারটি নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়েছে। ভগবান বা ঈশ্বরের ভয় দেখিয়ে মানুষকে পাপ থেকে যদি বিরত রাখা যেত, তাহলে রাষ্ট্রে পুলিশ-দারোগা-আইন-কানুন-কোর্ট-কাছারির আর প্রয়োজন হতো না। অনেকেই মনে মনে বা প্রকাশ্যেই এ ধরনের ধ্যান-ধারণা পোষণ করেন যে, “নাস্তিক-অধার্মিক লোকজন রাষ্ট্রে আছে বলেই পুলিশ দারোগার প্রয়োজন, কারণ তাদের দ্বারাই বেশি অপরাধ সংঘটিত হয়।” পাশ্চাত্যবিশ্বে ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের পুরোধা এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসনের মতে—“যেহেতু অবিশ্বাসীরা ডারউইনের মতানুসারে মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেহেতু তারা যেকোনো নাফরমানি করতে পারে; সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্নোগ্রাফি, তালাক গণহত্যা সবকিছু” (১২)। এমন একটা ভাব ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত যেন সারা পৃথিবী এগুলো থেকে মুক্ত ছিলো। একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি হিসেবে ফিলিপ জনসনের এধরনের আবেগপ্রবণ আপ্তবাক্যাবলিতে আমার বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, বরং আমার আস্থা থাকবে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফলে; বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন, ‘Let the data decide’। আমি ফিলিপ জনসনের সর্মথনে এমন কোনো উপাত্ত খুঁজে পাইনি যা থেকে

প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চাইতে বেশি অপরাধপ্রবণ; বরং কিছু পরিসংখ্যান একেবারেই উল্টো সিদ্ধান্ত হাজির করছে। আমেরিকায় বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে নাস্তিকদের চাইতে 'পুনরুজ্জীবিত খ্রিস্টান'দের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেশি; এও দেখা গিয়েছে যে, পরিবারের পরিবেশ ধর্মীয়গতভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সে সমস্ত পরিবারেই বরং শিশুদের উপর পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের দ্বারা বেশি যৌন নিপীড়ন হয়। ১৯৩৪ সালে Abraham Franzblau তার গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন ধার্মিকতা ও সততার মধ্যে বৈরি সম্পর্কই বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে Murray Ross-এর গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ধার্মিকদের তুলনায় নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকেন, দেশ ও দশের উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগি আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিলো। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিলো তা অবাক করার মত; আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোনো না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী (১৩)। আমেরিকায়ও এরকম একটি জরিপ চালানো হয়েছিলো ৫ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে। সে জরিপে দেখা গেছে—আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০%) ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম (মাত্র ০.২১%), সে তুলনায় ধার্মিকদের মধ্যে শতকরা হিসেবে অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশি (১৪)। আজ বাংলাদেশেও জরিপ চালালে ভারতের মত ফলাফল পাওয়া যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেশতের লোভ বা দোজখের ভয় কোনটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি। আল্লাহর গুনাহ বা ঈশ্বরের শাস্তির ভয় যদি মানুষকে পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেশতে পরিণত হতো। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা আজ কি দেখছি? বাংলাদেশে শতকরা ৯৯ জন লোকই খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশটিই আজ পৃথিবীর শীর্ষে। ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু মানুষকে-দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারেনি, পারবেও না। অপরদিকে সিঙ্গাপুরের দিকে তাকানো যাক; অধিকাংশ লোকই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত। সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্রছাত্রীকে দেখেছি 'ধর্মীয় পরিচয়' জিজ্ঞাসা করলে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে 'ফ্রিথিঙ্কার' (মুক্তমনা)। অথচ ধর্ম নয় শুধুমাত্র আইনের শাসন আর সামাজিক মূল্যবোধগুলির চর্চা করে সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীর সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলির একটি। অধিকাংশ সিঙ্গাপুরবাসিরা খোদা-ঈশ্বরের নাম করেন না, নরকের ভয় অথবা স্বর্গের লোভও তাদের নেই; তবে কোন যাদুবলে তারা দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকছে?

উপরের পরিসংখ্যানগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মানুষ নিরীশ্বরবাদী হলেই ভালো হবে আর আস্তিক হলেই খারাপ/দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। বরং এটাই বোঝানো যে, ধর্ম কোনোভাবেই নৈতিকতার 'মনোপলি ব্যবসা' দাবি করতে পারে না। আসলে কোনো বিশেষ ধর্মের আনুগত্যের উপর কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন নির্ভর করে না, নির্ভর করে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আর সমাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের ওপর। আধুনিকযুগের জীবনযাত্রার প্রেক্ষাপটে একথা বলা যায়, প্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে নৈতিকতাকে বিশ্লেষণ করলে আর চলবে না, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান এবং বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রখ্যাত মনোবিদ, দার্শনিক ড. মাইকেল শারমার তাঁর বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, "সমাজ বিকাশের প্রয়োজনেই মানুষ কিছু নীতিকে প্রথম থেকেই গোল্ডেন রোল হিসেবে গ্রহণ করেছে, কারণ এই নীতির অনুশীলন ছাড়া সমাজব্যবস্থা টিকে থাকবে না"(১৫)। ড. শারমার তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মানব-বির্বতনের ধারাতেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহনশীলতা, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি গুণাবলির চর্চা হয়েছে। সভ্যতার প্রতিনিয়ত সংঘাত ও সংর্ঘষেই গড়ে উঠেছে মানবীয় 'Provitional ethics', যা মানুষকে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে। নৈতিকতার ব্যাপারটি শুধু মানবসমাজেরই একচেটিয়া তা নয়, ছোট স্কেলে তথাকথিত অনেক 'ইতর-প্রাণি'জগতের মধ্যেও কিন্তু এটি দেখা যায়। যেমন—"ভ্যাম্পায়ার বাদুরেরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য ভাগাভাগি করে, বানর এবং গরিলারা তাদের দলের কোনো সদস্য মানসিক-শারীরিকভাবে বির্পযস্ত থাকলে তাকে সহায়তা করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, এমনকি দশে মিলে কাজ করে তারা খাবার পর্যন্ত নিয়ে আসে। ডলফিনেরা অসুস্থ অপর সহযাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সৈকতের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে অসুস্থ ডলফিনটির পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেতে সুবিধা হয়, তিমি মাছেরা তাদের দলের অপর কোন আহত তিমি মাছকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। হাতিরা তাদের পরিবারের অসুস্থ বা আহত সদস্যকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে।" প্রাণিজগতের মধ্যে এ ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতার ঘটনা বিরল নয়।

তবে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, একটা সময় ধর্মীয় নৈতিক বিধানগুলোর একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিলো হয়ত প্রাচীন সমাজের উপর। নানা ধরনের ধর্মীয় বিধানই ছিলো আইন, ছিলো সুনীতিবোধ গড়ে তোলার ভিত্তিভূমি। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগামিতার সাথে সাথে ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাচ্ছে, অনেক আগেই ফুরিয়েছে ধর্মপ্রর্বতকের ভূমিকাও। আজ আধুনিক মননের অধিকারী মানুষের কাছে প্রাচীন ধর্মগুলো একেবারেই অপাঙক্তেয় হয়ে উঠেছে। কেউই আজ বিশ্বাস করে না তন্ত্র-মন্ত্রে অসুখ সারে, কিংবা পরিশ্রম ছাড়া শুধু প্রার্থনা করলেই ফল পাওয়া যায়। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আজও ধর্মগুরু কিংবা পয়গম্বরদের 'মহান মিথ্যার' চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ, আইনের শাসন আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অনেক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। ধর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতার বিষয়গুলো অগ্রণীচিন্তার মানুষদের কাছে গুরুত্বহীন; তাই আশা করতে পারি ধর্মমুক্ত মানুষেরাই হয়ত আগামীর পরিবর্তিত বিশ্বে নির্ধারণ করবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এক নতুন সংজ্ঞা।

তথ্যসূত্র :
১. আমি কেন ধর্মে বিশ্বাসী নই, বার্ট্রান্ড রাসেল (ভাষান্তরঃ অরিন ভাদুড়ী), দীপায়ন, কলিকাতা।
২. নাস্তিকতার সংজ্ঞা, সুমন তুরহান, মাসিক দেশ, ৪ নভেম্বর, ২০০২।
৩. অলৌকিক নয় লৌকিক, প্রথম খণ্ড, প্রবীর ঘোষ, দে'জ প্রকাশন, কলিকাতা।
৪. One Brave woman vs. Religious Fundamentalism, An interview with Taslima Nasrin, Free Inquiry megazine, Volume 19, Number 1, available online http://www.secularhumanism.org/library/fi/nasrin_19_1.html
৫. ধর্মের উৎস সন্ধানে (নিয়ান্ডার্থাল থেকে নাস্তিক), ভবানীপ্রসাদ সাহু, প্রবাহ, কলিকাতা।
৬. কোরানশরিফ (সরল অনুবাদ), অনুবাদক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ম্যাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; কোরান শরীফ (বঙ্গানুবাদ), মাওলানা খান মুহাম্মদ ইউসুফ আবদুল্লাহ, সোলেমানিয়া বুক হাউস; এবং পবিত্র কোরান শরীফ, আলহাজ মাওলানা এ কে এম ফজলুর রহমান মুন্সী, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী।
৭. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুনঃ The clash of Fundamentalism: crusades, jihads, Modernity by Tariq ali, Verso, Pbk edition (April, 2003) এবং Rogue State : A guide to the world's only superpower by william Blum, Common courage press (May, 2000).
৮. বাল্মীকি রামায়ণ, হেমচন্দ্র অনুদিত, রিফ্লেকট পাবলিকেশন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১০৬৭-৭১।
৯. মহাকাব্যগুলোতে মনুর প্রভাব বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুনঃ মহাকাব্য ও মৌলবাদ, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা। এবং Laws of Manu, translated with extracts from Seven Commentaries by G. Buhler, ed. F. Max Muller, Clarendon Press, Oxford, 1886।
১০. কিতাবুল মোকাদ্দস, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা।
১১. The Dark Bible, Complied by Jim Walker, available online : http://www.nobeliefs.com/Darkbible/DarkBibleContents.htm
১২. "Do Our Values come from God?, The Evidence says NO", Victor Stinger, http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Godless/Values.htm
১৩. অলৌকিক নয় লৌকিক, তৃতীয় খণ্ড, প্রবীর ঘোষ, দে'জ প্রকাশন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৩৯।
১৪. The results of the Christans Vs Atheists, in prison investigation, by Rod Swift, http://www.holysomke.org/icr-pri.htm
১৫. The Science of God & Evil: Why people cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule, Michael Shermer, Newyork: Times Books, 2004.

বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস

অপার্থিব

প্রায়ই দেখা যায় ধর্মবাদীরা (Apologist) বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে দাবি করেন—ধর্মের সূত্র ও শ্লোকগুলি পাঠ করলে তার ভেতরেই বিজ্ঞানকে পাওয়া যায়। এখানে ধর্মবাদী বলতে ধর্মে বিশ্বাসী বোঝানো হচ্ছে না, যারা ধর্মকে পরম সত্য বলে দাবি করেন এবং এই দাবির সমর্থনে নিজস্ব যুক্তি উদ্ভাবন করেন, তাদেরকেই বোঝানো হচ্ছে। তাদের দাবি অনুযায়ী বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও মৌলিকতা ধর্মেরই প্রাপ্য। এই দাবি অবশ্যই ভ্রান্ত। কেউ যদি কোনো কিছুর মধ্যে বিজ্ঞান দেখতে বদ্ধপরিকর হন, তবে তিনি তাই দেখবেন। কোনো এক ব্যক্তি 'ক' একশ বছর আগে কথার ছলে কোনো প্রসঙ্গে বলেও থাকতে পারেন যে,—এ জগতের সবকিছুই আপেক্ষিক। তাই বলে কি আমরা দাবি করতে পারি 'ক' আইনস্টাইনের আগেই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব জানতেন? এর জন্য কী তাঁকেই ('ক'-কে) মৌলিকতার কৃতিত্ব দেয়া উচিত? মানুষের বা ধর্মপুস্তকের কোনো অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে বা দ্ব্যর্থক বক্তব্য বা শ্লোককে যে যার ইচ্ছা মত সুবিধাজনক ব্যাখ্যা বা অর্থারোপ করে বিজ্ঞানের কোনো এক সূত্রের সঙ্গে জোর করে মেলাতেই পারেন। বিশেষ করে সূত্রটার সত্যিকার জটিল এবং নিখুঁত বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় ব্যক্ত না করে যদি তাকে অতিসরলীকৃতভাবে বলা হয়, তাহলে মিলের একটা আভাস বের করা কঠিন কাজ নয়। এটা বলা ভুল হবে না যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই, ধর্মীয় পুস্তকের কোনো বাণী বা সূত্রকে ভিত্তি করে বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঘটেনি। তাই ধর্মকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেয়া বা ধর্মের উপর মৌলিকতা আরোপ করা একটা বড় ভুলই হবে। জগত ও প্রকৃতির অনেক প্রশ্নেরই উত্তর বিজ্ঞান খুঁজে পায়নি এখনও। কিন্তু তার কোনোটার উত্তর আবার ধর্মের সূত্রও দিতে পারেনি। বিজ্ঞান যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় তখন সহসা ওই উত্তরটা আবার ধর্মবাদীরা ধর্মপুস্তকের কোনো অস্পষ্ট শ্লোক বা আয়াতে অনায়াসে খুঁজে বের করতে পারবেন সন্দেহ নেই। দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা প্রাপ্ত) অব্যবহিত পরেই ধর্মবাদিরা বিজ্ঞানের সেই সূত্রকে ধর্মপুস্তকের ভেতরে আবার আবিষ্কার করেন! এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি কখনো। ধর্মবাদীরাই বিজ্ঞানকে অনুসরণ করেন, উল্টোটা নয়। এটা কি শুধুই কাকতালীয় ব্যাপার? মনে হয় না। ধর্মে বিজ্ঞান খোঁজা বা বিজ্ঞানে ধর্ম খোঁজা একটা মহাভুল। এটা যে ভুল তা শুধু ধর্মে অবিশ্বাসী বা সংশয়বাদীরাই বলেন না, ধর্মে বিশ্বাসী প্রখ্যাত প্রয়াত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আব্দুস সালামও এটা জোর দিয়ে বলেছিলেন। অনেকের বিজ্ঞানের 'মহাবিস্ফোরণ' (Big Bang)-এর তত্ত্বকে ধর্মের কোনো আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টায় অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলতেন যে 'মহাবিস্ফোরণ' হল জগত সৃষ্টির একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। সময়ের সঙ্গে জগত সৃষ্টির ব্যাখ্যায় অন্য কোনো উন্নততর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও আমরা পেতে পারি, কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাত্রই ক্রমাগত পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়। তিনি প্রশ্ন করতেন তখন সেই ধর্মবাদীরা কি ধর্মীয় শ্লোক বা আয়াতটির ব্যাখ্যাও সংশোধিত করবেন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য? বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করার বিপদ এভাবেই তুলে ধরেছিলেন অধ্যাপক সালাম। দুঃখের বিষয় অধ্যাপক সালামের চেয়ে অনেক নিচু সারির কিছু বিজ্ঞানী এখনও বিজ্ঞানকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, নানা প্রবন্ধ পুস্তক ও বক্তৃতার মাধ্যমে, যার অনেকটাই কুযুক্তিতে ভরা। কুযুক্তি বা সুবিধাবাদী যুক্তির মাধ্যমে শুধু যে অস্পষ্ট ধর্মীয় শ্লোক বা আয়াতকেই বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলানো যায় তাই নয়, অনেক প্রখ্যাত কবির কবিতায়, পুরাতন প্রবাদবাক্যে, একইভাবে চেষ্টা করলে বিজ্ঞানের সন্ধান মিলবে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করার চেষ্টায় ধর্মবাদীরা দুটো পন্থা অবলম্বন করেন। একদল ধর্মবাদীরা এটা মেনে নিয়েছেন যে বিজ্ঞানের সাফল্য, মর্যাদা, যথার্থতা অবিসংবাদিত। তাঁরা যুক্তি দেন যে বিজ্ঞান ধর্মের বাণীকেই সমর্থন করে। অর্থাৎ ধর্মের বাণী বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার অনেক ধর্মবাদী আছেন যারা বিজ্ঞানকে খাটো করে দেখে এই যুক্তি দেন যে বিজ্ঞানের সব কিছুই ধর্মের বাণী যা বলে তারই সমর্থন। অর্থাৎ বিজ্ঞান ধর্মের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (দুটোর সূক্ষ্ম তফাৎ লক্ষ্য করুন)। দুটো যুক্তিরই ত্রুটি আছে। প্রথমোক্তের যুক্তি অনুযায়ী বিজ্ঞানকেই মুখ্য ধরে ধর্মকে বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থন/যাচাই করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্পষ্টই বিজ্ঞানের নিরিখে ধর্মকে যাচাই করার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। কিন্তু এটা ধর্মবাদীদের জন্য স্ববিরোধিতারই সামিল। কারণ তাঁদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্মও স্থান সবার উপরে। দ্বিতীয়োক্তের ত্রুটি হল যে তাঁরা ধর্মকে মুখ্য ধরে বিজ্ঞানকে ধর্মের দ্বারা যাচাই করার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিজ্ঞানকে ধর্মের দ্বারা যাচাই বা সত্য প্রমাণ করতে হলে বিজ্ঞানের ভাষায় ও বৈজ্ঞানিক শব্দাবলি ব্যবহার করেই করা সমীচিন, যা সূক্ষ্ম এবং দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু ধর্মের বাণী বা শ্লোকগুলির ভাষা খুবই সাধারণ, অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থক, যা কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণাবাহী শব্দ ব্যবহার করে না, তাই বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি পূরণ করতে পারে না। জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি কোনো জটিল

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সাধারণ পাঠকের জন্য সহজ ভাষায় ব্যক্ত করলে তার ভাষাতেও একটা ন্যূনতম বৈজ্ঞানিক ধারণা, শব্দাবলি ও স্পষ্টতা দেখা যায়, যা ধর্মের বাণী বা শ্লোকগুলিতে অবর্তমান ।

এখন বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার আর এক সমস্যাপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনায় আসি । এই যুক্ত করার প্রয়াস কম-বেশি সব ধর্মেই দেখা যায় । এমন অনেক বই বা প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দেয়া যায় যাতে বিজ্ঞানের দ্বারা বাইবেলের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে; যেমন—"Genesis and the Big Bang: The Discovery of Harmony Between Modern Science and the Bible, Gerald L. Schroeder". কেউ তাওরাতকে বিজ্ঞানের আলোকে সত্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, যেমন—"Thinking About Creation: Eternal Torah and Modern Physics, Andrew Goldfinger." আবার কেউবা বেদকে পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, যেমন "Vedic Physics—Raja Ram Mohan Roy, Subhash Kak" এখানে উল্লেখ্য যে এই রাজা রামমোহন রায় (উল্লিখিত বইয়ের লেখকদ্বয়ের একজন) কিন্তু ইতিহাসের সেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন নন । যাহোক, এই সব প্রয়াসের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক মিল দেখা যায় । সেই ধর্মীয় শ্লোকের অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে দ্ব্যর্থক ভাষায় সুবিধাজনক ব্যাখ্যা দিয়ে মিল খোঁজার চেষ্টা । এই চেষ্টায় কোনো ধর্মই এমন কোনো বিশেষত্ব দেখাতে পারে না, যার জন্য অন্য সব প্রয়াস থেকে তাকে আলাদা কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সর্বসম্মতক্রমে যুক্তিসঙ্গত বলে রায় দেয়া যায় । কারও কাছে 'ক' ধর্মের যুক্তি অধিক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে, আবার কারো কাছে 'ঘ' ধর্মের । বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার এই প্রয়াসের মূল কারণ যেহেতু একটি বিশেষ ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করা, সেহেতু নিরপেক্ষ, যুক্তিনির্ভর কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে হয় সব ধর্মই সত্য প্রমাণিত হতে হবে অথবা সবই ভুল প্রমাণিত হবে । যেহেতু সব ধর্মই একই সাথে সত্য হতে পারে না (কারণ যে কোনো দুই ধর্মের মধ্যেই এক বা একাধিক পরস্পর বিরোধী বাণী আছে), সেহেতু বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার প্রয়াসকে সঠিক বিচার করলে সব ধর্মই ভুল এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় । একটা উদাহরণ দেয়া যাক :— মালি দেশে ডোগান (Dogan) নামক এক সম্প্রদায় আছে, যাদের লোককথা অনুযায়ী আকাশে একটা তারা আছে, যে তারায় তাদের উদ্ধারকারী প্রভু বাস করেন । আধুনিক পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদ্যার অনেক আগেই তাদের লোককথায় তারাটির আকাশে অবস্থান, তার আবর্তনকাল সবই উল্লেখ করা ছিল । পরে পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা বাস্তবিকই আকাশের ঐ স্থানে, সঠিক আবর্তনকালের একটা তারা আবিস্কৃত হয় যার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম Sirius–B বা Dog Star । ধর্মবাদিদের বিজ্ঞানের সত্যের দ্বারা ধর্মকে বিশ্বাসযোগ্য করাকে মেনে নিলে ডোগানদের ধর্মকে অবশ্যই সত্য বলে মেনে নিতে হবে । কিন্তু বিচার বিশ্লেষণের আলোকে কোনটা মনে করা সঙ্গতিপূর্ণ, যে আসলেই ডোগানদের ধর্ম সত্য, তাদের প্রভু সত্যিই ঐ তারায় বাস করেন যিনি ঐ তারার সঠিক তথ্যটি তাদেরকে প্রদান করেছেন? না-কি এটা মনে করা যে, যেহেতু আমরা জানি যে প্রাচীনকালেও সুমেরিও, মিশরীয়, গ্রিক, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা উন্নত ছিল, হয়ত এই তথ্য তাদের জানা ছিল । কোনো প্রকারে এই তথ্য কালের স্রোতে ভেসে গিয়ে কেবলমাত্র ডোগানদের কাছেই সংরক্ষিত হয়ে থাকে? বা অন্য কোনো সম্ভাবনা? (ডোগানদের এই ঘটনার কথা জানতে হলে পাঠকরা এই ওয়েবসাইট দুটো দেখতে পারেন : (১) http://www.cyber-north.com/ufo/dogan.html (২) http://home.earthlink.net/~pleiadesx/chaptr5.htm)

সমস্যাটির মূলে রয়েছে বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার প্রয়াসের অন্তর্নিহিত আত্মনির্ভরতা (Subjectivity), কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভাষা অবশ্যই বস্তুনির্ভর (Objective); কাজেই ধর্মের দ্বারা বিজ্ঞানকে যথার্থায়ন বা বৈধকরণ (Validation) বা বিজ্ঞানের দ্বারা ধর্মকে যথার্থায়ন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য ।

এতক্ষণ ধর্ম ও বিজ্ঞানকে যুক্ত করার প্রয়াস নিয়ে আলোচনা করলাম । এবার আসি কিছু ধর্মবাদিদের বিজ্ঞানকে ধর্মের বিপরীতে এনে তাকে খাটো করে দেখানোর বা ধর্ম যে বিজ্ঞানের চেয়ে কোনো অংশে কম-সত্য নয়, তা প্রমাণ করার প্রয়াসে । তাদের একটা যুক্তি হল যে বিজ্ঞানের সত্যের ভিত্তিও তো 'বিশ্বাস' । বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পাওয়া বিজ্ঞানের সত্যকে 'সত্য' বলে যদি গ্রহণ করা যায়, তবে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পাওয়া ধর্মীয় সত্যকে কেন 'সত্য' বলে গ্রহণ করা যাবে না? এই যুক্তির একটা সমস্যা হল যে শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোনো মতকে সত্য বলে দাবি করলেই যদি তাকে 'সত্য' বলে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সব ধর্মকেই 'সত্য' বলে মানতে হয় । আর শুধু ধর্ম কেন, পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় বা উপজাতির বিশ্বাস ও কুসংস্কারভিত্তিক মত ও তথ্যকেও সত্য বলে মানতে হয় । তারা এটা বোঝেন না যে বিজ্ঞানের সত্য আর ধর্ম যাকে সত্য বলে দাবি করে, তার ভিতর এক বিরাট পার্থক্য আছে । বিজ্ঞানের সত্য যুক্তি আর প্রমাণের (Logic & Evidence) দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে এবং সর্বজনীনভাবে যাচাইকৃত; এবং যাচাইকরণের প্রণালীও বস্তুনির্ভর । বিজ্ঞানের সত্যকে 'সত্য' বলে গ্রহণ করার কারণ সেটাই, বিশ্বাসের জন্য নয় । কোনো ধর্মের দাবিকৃত 'সত্য'ই বস্তুনির্ভর যুক্তি আর প্রমাণের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে এবং সর্বজনীনভাবে যাচাইকৃত হয়নি । কোনো এক বিশেষ ধর্মের সত্যের দাবিদার কেবল সেই ধর্মের অনুসারিরাই; এবং তাদের সত্যের যুক্তি আত্মনির্ভর । এই দাবি সত্য বলে গ্রহণ করার ন্যূনতম মাপকাঠিও পূরণ করে না । এটা সত্য যে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যেরই সূত্রপাত বিশ্বাস থেকেই । কিন্তু সে বিশ্বাস কোনো দৈবশক্তি বা

মনুষ্য কর্তৃক প্রদত্ত কোনো বাণীর উপর ভিত্তি করে নয়, বরং বুদ্ধিমান অনুমান (যেমন অক্কামের সূত্র বা Occam's Razor নামক এক পরীক্ষিত দার্শনিক সূত্র), স্বজ্ঞা, সাধারণ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ এর উপর নির্ভর করেই; এবং সেই অনুমান কোনো বিশেষ ধর্ম বা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস আর অন্য সকল বিশ্বাসের মধ্যে আছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে 'প্রকল্প' (Hypothesis) বলা হয়। কিন্তু প্রকল্প বিশ্বাসভিত্তিক অনুমান হলেও সেই অনুমানকে আরো পরিশীলিত করে যুক্তি, প্রমাণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে একটা তত্ত্বে না আসা পর্যন্ত তাকে সত্য বলে দাবি করেন না বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানের সত্যের দাবিতে জবাবদিহিত্ব নিহিত আছে। বিজ্ঞানের 'সত্যে'র দাবিকে 'মিথ্যাকরণ' (Falsification) বা সংশোধন/পরিশীলন করা সম্ভব, যা অন্য কোনো 'সত্যে'র দাবির বেলায় প্রযোজ্য নয়, কারণ সেগুলি শর্তহীন; পরমভাবে সত্য বলে দাবি করা হয়, আর যেহেতু তা বস্তুনির্ভর যুক্তি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়, সেহেতু তাদের দাবিতে 'মিথ্যাকরণে'র সম্ভাবনাকেও স্থান দেয়া হয় না।

উপরের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Scientific Method) আভাস উল্লেখ করা হয়েছে। 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' বলতে কি বোঝায় তার কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল পর্যবেক্ষণের এক সুসংহত ব্যাখ্যা বের করা এবং এর দ্বারা প্রকৃতির কোনো সূত্র-বিধির উদ্‌ঘাটন করা। নিচে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হল, ক্রমিক অনুযায়ী :—

১। প্রথমে আসে পর্যবেক্ষণ বা অবেক্ষণ (Observation)
২। পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রতিসাম্য, সরলতা (Symmetry/Simplicity) প্রভৃতির ধারণা ও বিবেচনাকে বিধৃত করে কিছু সম্ভাব্য প্রকল্প (Hypothesis) প্রস্তাব দেয়া।
৩। যুক্তি ও অদ্যাপিলব্ধ প্রজ্ঞা ও প্রমাণকে (Logic & Evidence) কাজে লাগিয়ে প্রকল্পকে একটা তত্ত্বে (Theory) উন্নীত করা।
৪। তত্ত্বের ভিত্তিতে কিছু ভবিষ্যৎবাণী করা (মানুষের ভাগ্য নয়, পর্যবেক্ষণের)।
৫।প্রকৃতি বা পরীক্ষাগারে লব্ধ পর্যবেক্ষণের দ্বারা ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা/ ভ্রান্ততা যাচাই করা।
৬। যদি ৫ নং ধাপে ভবিষ্যৎবাণী ভ্রান্ত বলে প্রমাণ হয় তাহলে ২ নং ধাপে ফিরে গিয়ে বিকল্প কোনো প্রকল্প প্রস্তাব করে আবার ৩নং ধাপ থেকে শুরু করা এবং যতক্ষণ না ৫ নং ধাপে ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা যাচাই না হয় এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করা।
৭। ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা অনেকবার যাচাই হলে তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা বিধির (Scientific Law) পর্যায়ে উন্নীত করা।

এটা উল্লেখ্য যে বৈজ্ঞানিক সূত্রে উন্নীত হওয়ার পরেও যদি কখনো কোনো পর্যবেক্ষণ সূত্রের ভবিষ্যৎবাণীর বিরুদ্ধে যায় তাহলে সেই সূত্রকে পরিত্যাগ করে পুনরায় উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি নেয়া হয়। অনেক সময় নতুন কোন পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করার জন্য সূত্রটিকে পরিত্যাগ না করে পরিবর্ধন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যার ফলে পূর্বের ও নতুন পর্যবেক্ষণ উভয়কেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সূত্রটির পূর্বের রূপকে ভুল বলা ঠিক হবে না, বরং তা এক সীমিত পর্যবেক্ষণ সমষ্টির মধ্যে প্রযোজ্য বলে ধরে নেয়া হবে। যেমন—আপেক্ষিকতার বিশেষ ও সাধারণ তত্ত্ব। 'আপেক্ষিকতার সাধারণতত্ত্ব' আবিষ্কারের জন্য আপেক্ষিকতার বিশেষতত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়নি, বরং তার কার্যক্ষেত্রের সীমা নির্ধারিত হয় মাত্র। এখন আসি বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু ভ্রান্তিমূলক উক্তি ও ধারণায় :

১। অনেক ধর্মবাদীরা কোন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যেই মতান্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এই যুক্তি দেন যে, বিজ্ঞানীদের মধ্যেই যেখানে এত ভিন্নমত, সেখানে বিজ্ঞানের সত্যের দাবির কী বিশ্বাসযোগ্যতা আছে? তারা ধর্মীয় সত্যের দাবির ব্যাপারে ধর্মানুসারে 'ঐক্যমত'-এর কথা উল্লেখ করে ধর্মের সত্যের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেন।

ধর্মবাদীদের উপরোক্ত যুক্তির দুটো ত্রুটি ধরা পড়ে। প্রথমত, ধর্মীয় সত্যের দাবির ব্যাপারে ধর্মানুসারে একমতের কারণ হল এই যে, ধর্মবিশ্বাসের মূল পূর্বশর্তই হল ধর্মের সত্যের দাবিকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা এবং তার প্রতি ক্রমাগত অন্ধ-আনুগত্য প্রদর্শন করে যাওয়া। বস্তুনির্ভর বিচার বিশ্লেষণের কোনো স্থান নেই ধর্মবিশ্বাসে। যারা এই পূর্বশর্ত স্বাভাবিকভাবেই নেন, শুধু তারাই তো ধর্মানুসারী। কাজেই ধর্মের ব্যাপারে ধর্মানুসারীদের 'ঐক্যমত' দিয়ে ধর্মের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা ভিত্তিহীন এবং ত্রুটিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, কোনো বিশেষ তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীমহলে মতান্তর থাকলে তাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সত্যের ভুল বা যথার্থতার অভাব প্রমাণিত হয় না। কারণ বৈজ্ঞানিক মতান্তর সেই তত্ত্বের ক্ষেত্রেই ঘটে যেখানে এখনো পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের অভাবে বা প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি সঠিক, সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পর্যবেক্ষণের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবার পরেই কেবল তা বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা পায়। তত্ত্ব থেকে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই এক অঙ্গ বা রেওয়াজ। বৈজ্ঞানিক মতান্তর বৈজ্ঞানিক সত্য আহরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক তত্ত্ব থাকলেই পর্যবেক্ষণের বাছাই-ক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক তত্ত্বটি, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্যটি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এটা বিজ্ঞানের শক্তি, দুর্বলতা নয়। তবে এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভুল হলেও তা যুক্তিহীন, বিশ্বাসভিত্তিক নয়, ভুলের কারণ সাধারণতঃ কোনো

ভ্রান্ত অনুমান (Premise), প্রকল্প বা উপাত্ত (Data) বা আরো সঠিক অর্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ২ নং ধাপে মতান্তরের জন্য (যে কারণেই হোক); ভুলই হোক বা সত্যই হোক, কোনো তত্ত্বে যুক্তিহীনতা থাকলে বা তা শুধু বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই প্রস্তাবিত হলে সেটি তত্ত্ব বলে গৃহীত বা গণ্যই হবে না।

২। ধর্মবাদীদের দ্বিতীয় এক ভ্রান্তিপূর্ণ উক্তি হল—বিজ্ঞানের সীমা আছে, সব কিছুর উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর ধর্মেই খুঁজতে হবে। এই উক্তির ত্রুটি হল বিশ্বাসকে জ্ঞান বা জানার (Cognition) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। 'বিশ্বাস' এক ব্যক্তিনির্ভর অনুভূতি, সেটাকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ তার মনের কোনো প্রশ্নের উত্তর বা সত্যকে জানা বলতেই পারেন। কিন্তু সেই অনুভূতিভিত্তিক ব্যক্তিগত সত্যের উপলব্ধিকে কেউ যদি সত্য বলে বাহিরে প্রচার ও যাহির করতে চেষ্টা করেন, তখন অন্যকে তা সত্য বলে মেনে নিতে হলে সত্য যাচাইয়ের সব মাপকাঠিকে প্রয়োগ করতে হবে; এবং সেটা যদি বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো সত্য যাচাইয়ের মাপকাঠির ধোপে না ঠেকে তাহলে সেটাকে সবার জন্য সত্য বলে মেনে নেয়ার কোনো যুক্তিকতা থাকে না, উপরন্তু যেহেতু দাবিদার ঐ সত্যটিকে নিজের ব্যক্তিগত গণ্ডির বাইরে এনে তাকে 'সত্য' বলে সবার সামনে পেশ করেছেন, সেহেতু দাবিকে যুক্তি-প্রমাণের আওতায় আনা এবং তা মাপকাঠিতে না টিকলে সেই দাবিকে যুক্তিহীন বলে দাবি করাটা মোটেই অযৌক্তিক হবে না। এটা বলাই বাহুল্য যে আজ পর্যন্ত ধর্ম এমন কোনো সত্য দিতে পারেনি, যা কিনা যুক্তি প্রমাণের মাপকাঠিতে টিকতে পারে এবং যা বিজ্ঞানের দ্বারা আগেই জানা যায় নি।

৩। আরেক ভ্রান্ত উক্তি হল:—"বিজ্ঞান দাম্ভিকতাপূর্ণ, বিজ্ঞানীরা সবজান্তার ভান করেন..." ইত্যাদি। আসলে সত্য কিন্তু উল্টোটাই। বৈজ্ঞানিকেরাই সর্বদা ভুলের সম্ভাবনার জন্য সদাজাগ্রত থাকেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেই বিনয় নিহিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংশোধন বা পরিবর্ধনের স্থান সর্বদাই রাখা হয়। বড় বড় অনেক বৈজ্ঞানিকই অনেক ভুল করেছেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে তা স্বীকারও করেছেন। যেমন, আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত সাধারণ মহাকর্ষ সমীকরণে একটি পদ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যা পরবর্তীতে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে উল্লেখ করেছিলেন। নোবেল বিজয়ী রসায়নবিদ লিনাস পলিঙ্গও ডি.এন.এ অণুর গঠনে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন, যা নোবেল বিজয়ী ওয়াটসন এবং ক্রিক সঠিকভাবে দিয়েছিলেন প্রায় একই সময়ে। বিজ্ঞানীরা নিজেকে অভ্রান্ত মনে করেন না এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকেও বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীরা কখনোই পরম সত্যের মর্যাদা দেয় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বৈজ্ঞানিক সত্যের চেয়ে অন্য কোনো সত্যের দাবি সমান বা বেশি বিশ্বাসযোগ্য। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমেই ধাপে ধাপে প্রকৃত সত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সত্যকে জানার জন্য এরচেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য কোনো পথ বা সাধনী মানুষ প্রজাতির জানা নেই।

ধর্ম ও নারীর গল্প

নন্দিনী হোসেন

ধর্মের সাথে নারীর সম্পর্কটা ঠিক কী, সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব বাস্তবতার আলোকে। 'ধর্ম' বিষয়টা যদি আধ্যাত্মিক হয়ে থাকে তাহলে সেটার প্রভাব সমাজে হয় একরকম—আর তা যদি হয় আচার-আচরণসর্বস্ব, তখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ক্ষেত্র বিশেষে তিক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলমানরা দাবি করেন ইসলাম ধর্মে নারীকে সবচেয়ে মর্যাদার আসন দেওয়া হয়েছে। আসলেই কি তাই? আমরা যদি বাস্তবতার আলোকে বিষয়টা যাচাই করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের মোহভঙ্গ হতে বাধ্য। ইসলামকে বলা হয় সবচেয়ে আধুনিক ধর্ম। যেহেতু অন্যান্য ধর্ম থেকে অনেক পরে এসেছে। তারপরও মেঘে মেঘে বেলা তো আর কম হল না! আমাদের এখন ভেবে দেখতে হবে আসলেই তা এখন আর কতটা আধুনিক!

ধর্মীয় ভাবাবেগের বাইরে দাঁড়িয়ে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে যুক্তির আলোকে—প্রায় দেড়হাজার বছর আগের একটা ধর্ম এখন কালের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারার মত যুগোপযোগী রয়েছে কি না।

পৃথিবীর সবকটি প্রধান ধর্মই এসেছে কোনো না কোনো পুরুষের হাত ধরে। তাই হয়ত নারী, ধর্মে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবেই থেকে গেছে। ধর্মের সাফাই গাইতে গিয়ে জোর গলায় যাই বলা হোক না কেন, বাস্তবতা কিন্তু ভিন্নচিত্রই উপস্থাপন করে। যখন থেকে নারী নিজের শরীরকে সবচেয়ে বড় শত্রু ভাবতে শুরু করেছে, তখন থেকেই তার পতনের শুরু। নারী যেহেতু গর্ভধারণ করে, সেহেতু খাদ্য সংগ্রহের ভার নিল পুরুষ আর নারী ঘরের ভিতর নিজেকে আবদ্ধ করে স্বামী নামক প্রভুর (প্রভু—কারণ খাদ্যের যোগানদার!) সেবা আর সন্তান লালন-পালনেই জীবনের মোক্ষ খুঁজল। সেই থেকেই হয়ত পুরুষও নিজেকে সর্বেসর্বা ভাবতে শুরু করল। অবশ্য নারীর ভূমিকা এক্ষেত্রে মোটামুটি সহযোগীর-ই। পুরুষ যাই বলেছে, সে তা মাথা নিচু করে মেনে নিয়েছে। পুরুষ নারীকে যত রকম ভাবে আটঘাট দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে তারমধ্যে প্রধানতম হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের কথা বলে নারীকে যত সহজে কাবু করা গেছে, তা বোধহয় আর কিছুতেই সম্ভব হত না। তাই তো দেখি বাংলা ভূ-খণ্ডে একজন মাত্র তসলিমাকে নিয়ে 'ধর্মের' এত ভয়!

যাই হোক, কোরান, বাইবেল, গীতায় কী লেখা আছে সে বিতর্কে যাওয়ার ইচ্ছা বা আগ্রহ আমার মোটেই নেই। তারপরও কোরান থেকে দু-একটা সুরা উল্লেখ করলে, বুঝতে সুবিধা হবে তথাকথিত আধুনিক ধর্ম নারীকে কী দৃষ্টিতে দেখে। সুরা আন নিসা (৪:৩৪)—"পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল কারণ, আল্লাহ একেকে অন্যের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষরা তাদের অর্থ ব্যয় করে।" কোন ধরনের বিশিষ্টতা দান করেছেন? একটা তালিকা থাকলে বোধহয় ভাল হত, বুঝতে সুবিধা হত আমাদের। আর অর্থ ব্যয়? আজকাল শুধু কি পুরুষই অর্থ ব্যয় করে?

দেখা যাচ্ছে 'ধর্মের' দৃষ্টিতে স্বামী সংসারের জন্য খেটে মরেন, তিনি সংসারের কর্তা। বাইরে গিয়ে সংসার চালানোর জন্য রুজি-রোজগার করেন। স্ত্রীর যেন কোনো কাজই নেই, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো ছাড়া! তিনি সংসারে শুধু শুয়ে-বসে স্বামীর কষ্টের রোজগারে ভাগ বসিয়ে অন্ন ধ্বংস করেন! অতএব পুরুষের সৃষ্ট ধর্মের দৃষ্টিতে নারী দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হবেন না তো কি? তিনি স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করবেন, অথবা সেজদা করবেন—এটাই তো পুরুষ রচিত ধর্মে স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্নটা হল—দেড়হাজার বছর আগে হয়তোবা মরুভূমির বুকে নারীর তেমন কোনো আয়-রোজগারের উপায় ছিল না বাইরে গিয়ে,—কিন্তু আজ একবিংশ শতাব্দীতে এমন লক্ষ-কোটি নারী আছেন, যারা একাই সংসার চালান; সন্তান মানুষ করেন। 'স্বামী' নামক প্রভুর অবদান সেখানে অতি সামান্যই—সেক্ষেত্রে ধর্মের বিধান উল্টে কি এখন নতুন করে সংযোজন করা উচিত নয়? হাজার-হাজার বছর আগের মরুর বুকে যে 'সর্বশেষ এবং সর্বাধুনিক' ধর্ম এসেছিল, তা দিয়ে এখন এই একবিংশ শতাব্দীর নারীর জীবন যাপন কি চলে? নাকি চালানো সম্ভব? আজকের নারীর জীবনযাপন মধ্যযুগীয় ধর্মের নিগড়ে বেঁধে রাখতে চাইলে—তা হবে উঠের পিঠে যাত্রী হয়ে আবার গুহাযুগে ফিরে যাওয়া। যা নিতান্তই অবাস্তব। জোর করে মধ্যযুগীয় অবাস্তব ধারণা মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলে সংঘাত-সংঘর্ষ তো হবেই; হতে বাধ্য।

কিছুদিন আগে আমি একটি গল্প লিখেছিলাম। অবশ্য ওই লেখাটিকে গল্প না বলে, সত্যকাহিনীর গল্পরূপ বলা উচিত। একজন বিলেতপ্রবাসী ভদ্রলোক, যিনি নিজেকে শিক্ষিত বলে দাবি করেন, নিজের শিক্ষা নিয়ে তিনি বেশ গর্ববোধও করেন। তিনি, নিজের বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া মেয়ে বাসার সামনের রেস্টুরেন্টে স্কুল-জীবনের এক মেয়েবন্ধুকে নিয়ে আড্ডা দেওয়ায় স্ত্রীকে এই বলে শাসান—"মুসলমানের মেয়ে হয়ে কী করে সে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসে!" মেয়ে রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা দেওয়ার অপরাধে তিনি হুঙ্কার দিয়ে মা এবং মেয়ে দুজনেরই শাস্তি ঘোষণা করেন! কারণ, তিনি তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করান ধর্মের কাছে আশ্রয় নিয়ে। অন্য হাজারো যুক্তি তার ধর্মীয় আবেগের কাছে অচল! এরকম প্রতিক্ষণ, এত হাজারো রকম প্রতিবন্ধকতা ধর্মীয় অনুসারিরা নারীর জন্য তৈরি করেন, যা আমার এই দুই পাতার বিন্দুবৎ পরিধিতে ধারণ করার চেষ্টা করাও একটা বোকামি!

তো এই যদি 'সর্বশেষ এবং আধুনিক' ধর্মের অনুগত তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির 'ধর্মভাবনা' হয়, তাহলে বাংলার গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ-কোটি অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষের মনোভাব কি আর ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন আছে? উপরে বর্ণিত ভদ্রলোকের মত সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনোজগতেও 'ধর্ম' নামক শব্দটি এমন অদ্ভুত মনোবৈকল্য সৃষ্টি করে রেখেছে যুগের পর যুগ ধরে—এর যেন আর কোন নড়চড় নেই! ধর্মগ্রন্থের যুক্তি ৯৬ কাব্যিক ব্যঞ্জনাময় হেয়ালিপূর্ণ বাক্যের অর্থ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। কেউ যদি মনের মাধুরী মিশিয়ে ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খুঁজেন, তা তারা করতেই পারেন। কেউ যদি ভাবের ঘরে চুরি করে দাবি করেন, তাদের ধর্মে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তাও তারা গায়ের জোরে কিছু মানুষকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হতে পারেন। কিন্তু এভাবে আর কতকাল?

আমাদের দেশে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে প্রায় প্রতিটি তথাকথিত অর্ধশিক্ষিত-শিক্ষিত মুসলমানের ঘরে পর্যন্ত যে গ্রন্থটি আজও বিজয় গৌরবে চলছে, তা হচ্ছে—'মক্ছুদুল মো'মেনীন বা বেহেশ্তের কুঞ্জী' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, লেখক—আলহাজ্ব কাজী মাওলানা মোঃ গোলাম রহমান) আর কোন বই থাক বা না-থাক এই বই পাওয়া যাবার সম্ভাবনা খুব-ই বেশি। বিশেষ করে মুসলমান নারীদের অবশ্যপাঠ্য! আরও নানা কিছুর সাথে এই বইয়ের 'স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য' অংশে এমনসব কথাবার্তা আছে, যা নারীর জন্য অত্যন্ত অপমানজনক। পাঠকের সুবিধার জন্য দু'একটি হাদিসের বর্ণনা ওই বইয়ে যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তা পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করা হল:—

১। নবি মোহাম্মদ একদা তার সাহাবাদের উদ্দেশ্যে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, "যদি আমি কাহাকেও সেজদা করিতে হুকুম করিতাম তবে নিশ্চয়ই স্ত্রীদিগকে হুকুম করিতাম যে, তোমরা তোমাদের স্বামীগণকে সেজদা কর" [পৃষ্ঠা ৩২৭]। (বাব্বাহ! নারীরা বড় বাঁচা বেঁচে গেছে!)

২। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, "যখন স্বামী আপন বিবিকে ডাকিবে, তখনই আসিয়া হাজির হইতে হইবে, যদ্যপি সে (স্ত্রী) তন্দুরের উপরও থাকে। অর্থাৎ, যদি চুলার উপর দুধ জ্বাল দেওয়া কার্যে নিবিষ্ট থাকে, তথাপি স্বামী ডাকিবামাত্র আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে" [পৃষ্ঠা ৩২৭]। (আজকাল ক্রীতদাস প্রথা নাই, তবু ক্রীতদাসীকেও কোনো মানুষ এমন আদেশ দিতে পারে কি?)

৩। হাদিসে আছে, স্ত্রীর উপর পুরুষের কি প্রকার হক আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে হজরত (দঃ) বলিলেন, "যদি কোন পুরুষের শরীর হইতে সর্বদা পুঁজ-রক্ত বাহির হইতে থাকে, আর তাহার স্ত্রী ঐ সমস্ত নিজের জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া-চাটিয়া সাফ করিয়া দেয়, তথাপি পুরুষের হক রীতিমত আদায় হইবে না" [পৃষ্ঠা ৩২৯]। (ছিঃ ছিঃ কোনো সুস্থমানুষ কী চিন্তায় এসব ঠাঁই দিতে পারে, বিকারগ্রস্ত ছাড়া!)

অপরদিকে এই বইয়ে 'স্বামীর কর্তব্য' নামে যা বলা হয়েছে, তারও কিছু নমুনা দেয়া জরুরি মনে করছি; তাতে মুদ্রার দুই পিঠই বুঝতে সুবিধা হবে :—

১। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যেন নিজের স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর ন্যায় প্রহার না করে..." [পৃষ্ঠা ৩৭৮]।

২। হজরত (দঃ) ফরমাইলেন, "যখন তুমি খাদ্য খাইবে, তখন তোমার স্ত্রীকেও খাওয়াইবে। যখন তুমি পোষাক পরিধান করিবে, তখন তাহাকেও পরাইবে। আর কখনও তাহার মুখের উপর প্রহার করিবে না ও তাহাকে খারাপ গালি দিবে না এবং নিজের গৃহ ব্যতীত তাহাকে অন্য গৃহে শোয়াইবে না" [পৃষ্ঠা ৩৭৬]।

৩। হযরত (দঃ) আরও একটি হাদিসে ফরমাইয়াছেন, "স্ত্রীলোকের ইমান ও আকল পুরুষের ইমান ও আকলের অর্ধেকমাত্র..." [পৃষ্ঠা ৩৮০]।

উপরের হাদিসগুলোয় স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্তব্যে কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য! স্বামী-প্রভু মুখের উপর মারিতে পারিবেন না, ক্রীতদাসীর ন্যায় মারিতে পারিবে না, এসবের মানেটা কী? নারী কি আদৌ 'মানুষ' ধর্মের দৃষ্টিতে? এ থেকে সহজেই অনুমেয় 'সবচেয়ে আধুনিক ধর্মে' নারীর অবস্থান আসলেই কোথায়।

মোটকথা 'স্বামী' নামক ভদ্রলোকদের মাহাত্ম্যের কোনো শেষ নেই ধর্মে। মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যতরকমভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট করা হয়, তার সবচাইতে পুরোভাগে আছে 'ধর্ম' নামক শব্দটি। ধর্মের নামে সব জায়েজ হয়ে যায়; জায়েজ করা যায়। নারীও সবকিছুই গ্লোরিফাই করে নেয় ধর্মের নামে। মাও তাঁর মেয়েকে ধর্মের নামে জোর করে পাঠান লম্পট স্বামীর ঘরে। সমাজের কথা যদিওবা না ভাবলে চলে, কিন্তু ধর্মের তলব অস্বীকার করার মত মানসিক জোর হয়তোবা জন্মদাত্রী মায়েরও নেই! নারীর এখন সময় এসেছে এসব নিয়ে ভাবার। অন্যের শেখানো বুলি পোষা ময়নার মত আওড়ানো আর কতকাল?

আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন

সৈকত চৌধুরী

আধুনিক পৃথিবীতে সর্বত্রই ধর্মের ছড়াছড়ি। ধর্মগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে বিপুল সাদৃশ্য, তেমনি বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ও সরল আলোচনায় আসা যাক।

ধর্মগুলোর মধ্যে একটি বড় সাদৃশ্য হল, সকল ধর্মই দাবি করে সে-ই সত্য ও সর্বোৎকৃষ্ট, এছাড়া অন্যান্য ধর্ম মিথ্যা ও নিকৃষ্ট। আবার ধর্মগুলো যেমন ঐ ধর্মের অনুসারিদের জন্য বরাদ্দ রেখেছে স্বর্গ, তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বিদের জন্য নরক। কিন্তু ধর্মগুলোর ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলে থাকেন—যত মত, তত পথ। যেখানে এক ধর্মের কাছে অন্য ধর্ম সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সেখানে কথাটিতে স্ববিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছুই প্রকাশ পায় না। কেননা সত্য এক ও অখণ্ড; একই সময় একই সাথে পরস্পর বিপরীত দুটি কথা সত্য হতে পারে না। তাই, সকল ধর্মই মানবতার কথা বলে—এরকম যারা বলেন তারা হয় মানবতা বোঝেন না, নয়ত ধর্ম বোঝেন না; একটি ভুল জীবনদর্শন মানুষকে শুধু প্রতারণাই দিতে পারে।

হিন্দুরা দাবি করেন তাদের ধর্ম চিরায়ত ধর্ম, সেই আদিমকাল থেকে তাদের ধর্ম চলে আসছে, তাই তাদের ধর্ম খাঁটি ও সর্বোত্তম, যদিও অন্য কোনো ধর্মাবলম্বির এই ধর্মে স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার নেই এবং গোটা ধর্মটিই অনেক আদিম কুসংস্কারের আশ্রয়। হিন্দু ধর্মে আছে, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরাধর্ম ভয়াবহোঃ"—নিজের ধর্মে বিশ্বাসী থেকে মৃত্যুবরণ করলে পুরষ্কার প্রাপ্তি, ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করলে ভয়ঙ্কর শাস্তি। বিধর্মীর জন্য রয়েছে 'রৌরব নরক'। অহিন্দু মাত্রই যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি।

ইহুদিরা প্রচণ্ড ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তারা নিজেদের ঈশ্বরের একমাত্র মনোনীত জাতি বলে মনে করে—এ ধরনের বিশ্বাস নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে সকল মানুষ আদিপাপের বোঝা নিয়ে জন্মে; সকল মানুষই ইটারনেল ডেমনেসন বা অনন্ত কাল নরকভোগের উপযুক্ত, শুধু খাঁটি খ্রিস্টানরা ব্যতীত। বৌদ্ধধর্মের মূল ধারাটি নিরীশ্বরবাদী হওয়ায় অনেকে একে ধর্ম মনে করেন না, তারা মনে করেন এটি একটি দর্শন।

এবার আসা যাক, ইসলাম প্রসঙ্গে। ইসলাম ধর্ম একবাক্যেই সব ধর্মকে নাকচ করে দেয়। কোরানে আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম (৩:১৯)। ইসলাম মতে, মুসলমানরা মৃত্যুর পরে (পাপ মোচনের পর) চিরদিনের জন্য বেহেশতে যাবে আর অমুসলিমরা চিরদিনের জন্য দোজখে যাবে (২:৩৯)। (অনেকে অজ্ঞতাবশত বলে থাকেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বেলায় ব্যাপারটি অন্য রকম। কিন্তু ইসলামের মতে, ওঁদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত ও ইসলামের সকল মূল বিষয়ে তারা অবিশ্বাস করে, তাই তারা অবিশ্বাসী এবং স্রষ্টার সাথে শরিক করে বিধায় মুশরিকও বটে। কোরানে কিছু শর্তের বিনিময়ে তাদেরকে 'কোনো ভয় নেই' বলা হয়েছে যা স্পষ্টভাবে বেহেশ্ত বা দোজখকে নির্দেশ করে না। ঐ শর্তগুলো হল :- (১) আল্লাহকে বিশ্বাস করা (২) পরকালের বিচারে আস্থা রাখা (৩) ভালো ও ন্যায় কাজ করা। এখানে যে শর্ত উহ্য তা হল, যেহেতু মুহাম্মদ এগুলো বলেছেন তাই তাঁকেও বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ পক্ষান্তরে তাদেরকে মুসলিমই হয়ে যেতে হবে। তবে কেউ কেউ মনে করেন, এ ঘোষণা ছিল সাময়িক) এবার, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাই প্রায় সকল মানুষের ধর্মবিশ্বাস তার পিতা-মাতা বা পরিবারের উপর নির্ভর করে। একটি শিশু যে ধর্মাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সে সচরাচর সেই ধর্মেরই হয়ে থাকে, কেননা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী পরিবার শিশু কিছুটা বড় হয়ে উঠতে না উঠতেই তাদের ধর্মে গভীরভাবে বিশ্বাসী করে তোলার জন্য তোড়জোড় শুরু করে। শিশুটিকে পরিবারের ধর্মের বিভিন্ন অলৌকিকতার কেচ্ছা, পৌরাণিক কাহিনী, স্বর্গ, নরক, মহাপুরুষের মহৎকীর্তি ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। অন্য ধর্ম সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড ঘৃণাও এ বয়সে শিশুর মনে তৈরি করা হয়। শিশুদের মনে এগুলো স্থায়ীভাবে দাগ কাটে যার ফল হিসেবে সে কখনও স্বীয় পারিবারিক ধর্মের উর্ধ্বে কিছুই চিন্তা করতে পারে না। তাই সে সারা জীবন ধরে তার পরিবারের ধর্মেই থাকে, এমনকি তার ধর্মের এক শাখা পরিবর্তন করে অন্য শাখায়ও যায় না। এর অন্যথা খুবই বিরল। এছাড়া কোন মানুষের জন্য ধর্ম ত্যাগ বা অন্য ধর্ম গ্রহণ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার কেননা এতে পরিবার ও সমাজের সাথে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ সাধারণ মানুষই ধর্ম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে বা বুঝতে অক্ষম। যারা স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর (সমাজের বেশিরভাগ লোক) তাদের সে সুযোগই নেই। আমরা আজ থেকে দুয়েকশ' বছর পূর্বের কথা চিন্তা করলে দেখি অতি অল্পকিছু মানুষ ছাড়া সকলেই নিরক্ষর এবং অতিমাত্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সুতরাং হাজার বছরের আগে যেসব

ধর্ম প্রচারিত হয়েছে, আর যারা তা গ্রহণ করেছে, তারা কতটা সচেতনভাবে তা করেছে (যা বংশপরম্পরায় আজও সঞ্চারিত হচ্ছে) তা সত্যিই ভাবনার বিষয়। সভ্যতার ইতিহাসের মহাজ্ঞানী সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের কেউই যেখানে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে কথিত কোনো সত্য-ধর্ম গ্রহণ করেন নাই; সেখানে সাধারণ মানুষের, যাদের চিন্তার সীমা একেবারেই সীমাবদ্ধ তাদের ক্ষেত্রে এরকম আশা করা অবান্তর। অতি সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া সকলেই যেখানে নিজ-নিজ ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও এর ভাষা সম্পর্কে খুব স্বল্প জ্ঞান রাখে সেখানে তাদের পক্ষে অন্য ধর্ম সম্পর্কে খুব একটা জানার বা চিন্তা করার প্রশ্নই উঠে না। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে একটি মুসলিম পরিবারের সন্তান মুসলিম হচ্ছে এবং তদ্রূপ অমুসলিম পরিবারের সন্তান অমুসলিম হচ্ছে। জন্মের আগে বা জন্ম নিয়ে কেউ কোনো পাপ করেনি। তবে কেন একজন মুসলমান শুধুমাত্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে মুসলিম হওয়ায় মৃত্যুর পরে চিরকালের জন্য বেহেশতে যাবে আর একজন অমুসলিম শুধুমাত্র অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে অমুসলিম হওয়ায় চিরদিনের জন্য দোজখে যাবে? জন্মই যেখানে ধর্ম ঠিক করে দিচ্ছে সেখানে চিরকাল বেহেশত ও দোজখ ব্যাপারটি কি একটা অযৌক্তিক বিষয় নয়? প্রশ্নটি কিন্তু কিছুটা পরিবর্তন সাপেক্ষে সকল ধর্মের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। আর, মানুষের ধর্মগ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলেই আমরা অতি সহজে ধর্মগুলোর অসারতা প্রমাণ করতে পারি।

ধর্মগুলো বিশ্বাস নির্ভর। বিশ্বাস মানুষের একান্ত মনের ব্যাপার। কিন্তু ধর্মগুলো 'বিশ্বাস' মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। মুসলিম কেউ যদি ধর্ম ত্যাগ করে তবে তাকে মুরতাদ বলা হয় আর মুরতাদের শাস্তি শিরচ্ছেদ (শরিয়া আইন অনুযায়ী)। কোন অমুসলিম যদি মুসলিম হওয়ার পর তার আগের ধর্মে ফিরে যায় অথবা কোন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কেউ বাল্যকালেই অমুসলিম হয় তবুও সে মুরতাদ এবং শাস্তির বিধান একই। সকল ধর্মই তাদের ধর্মত্যাগীদের বেলায় অত্যন্ত কঠোর। মানব ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই মানুষ কখনো অগ্নিকে আবার কখনো সূর্যকে এমনকি কখনো গাছকেও দেবতা বলে মনে করে। আর, এরকম হাস্যকর বিষয়ে বিশ্বাস ও তার আরাধনায় মানুষ তার জীবন উৎসর্গ করে দিতে পারে। মানুষের এই 'বিশ্বাসটির' জন্য ধর্ম তবে এত লালায়িত কেন? যে মানুষ 'গরু' পূজা করতে পারে সে স্রষ্টার পূজা করলে স্রষ্টার গৌরব কতটা বাড়বে তা ভেবে দেখার বিষয়।

বেশিরভাগ আধুনিক ধর্মই ঈশ্বরকেন্দ্রিক অর্থাৎ ঈশ্বরকে খুশি করা, তার আরাধনা করাই ধর্মের মূল লক্ষ্য। প্রতিটি ধর্মেই ঈশ্বরের ধারণা অত্যন্ত অদ্ভুত। ঈশ্বরের করুণা, দয়া, ক্ষমতা অসীম। কিন্তু অসীম দয়া, করুণা বা ক্ষমতা বলতে আসলে কী বুঝায়? আর দয়াময় ঈশ্বরের নির্দেশে যখন জলোচ্ছ্বাস বা সিডরের মত ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে, তখনো বলতে হবে ঈশ্বর করুণাময়, অসীম দয়ালু। ঈশ্বর স্তুতিপ্রিয়, তিনি নিজে নিজেই চমৎকার সব গুণবাচক নাম ধারণ করেন যা অনুসারিদের বাধ্যতামূলকভাবে জপ করতে হয়। তিনি রাগও করেন, কখনো কখনো এমন রাগ করেন যে, তার আরশ বা সিংহাসনও নাকি কেঁপে উঠে। কোনো কোনো ধর্মে ঈশ্বরকে বলা হয় নিরাকার। নিরাকার অথচ সচেতন সত্তা, তার ক্ষমতা ও অসীম, তা সত্ত্বেও তার বসার জন্য প্রয়োজন কুরসি বা চেয়ার বা আরশ বা রাজসিংহাসন, আবার তিনি সর্বব্যাপী—একেই বোধ হয় বলে, 'বিল্ডিং এ কাসল ইন দা এয়ার'। যেহেতু নিরাকার কোনো সচেতন সত্তা আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই এবং অসম্ভব; তাই নিরাকার ঈশ্বরের ধারণার কোনো দার্শনিক বৈধতা নেই।

একেক ধর্মে পরলোকের ধারণা একেক রকম। ইসলামে রয়েছে শিঙ্গার ফুঁকে কিয়ামত হয়ে যাওয়া, সূর্য মাথার একহাত উপরে আসা, স্রষ্টার হাতে পাপ-পূণ্য পরিমাপের জন্য দাড়িপাল্লা নেয়া, পুলসিরাত ইত্যাদির ধারণা। অনেকে মনে করেন 'শয়তানের' ধারণার মত পুলসিরাতের ধারণাও ইসলাম জরথুস্ত্রবাদ থেকে পেয়েছে। স্বর্গ ও নরক নিয়ে একটু ভাবলেই আঁচ করা যায় যে, এর ধারণা 'সময় ও স্থানীয়তার' উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন গ্রিকদের কাছে সাগরের বিশাল তীর দিয়ে প্রসারিত শ্যামল প্রান্তর খুবই আকর্ষণীয় ছিলো—বিশেষ করে যখন সূর্যের কিরণ তাতে বিচ্ছুরিত হত। তাই তাদের স্বর্গ অনন্ত বসন্তের হাওয়া বিরাজিত, কোমল ভাবে অনন্ত কিরণ ধারা প্রবাহিত মহা প্রান্তর। হিন্দুদের মাতৃভূমি নদীমাতৃক ফল-ফুলে শোভিত। তাই তাদের স্বর্গে রয়েছে অব্যাহত শান্তি, মন্দাকিনী কলনাদে প্রবাহিত, কুসুম ধারে ধারে প্রস্ফুটিত, অপ্সরা গীতি-কাকলি মুখরিত মঞ্জুরিবীথিকায় অপূর্ব নর্তনে ক্রীড়ারত। যিশুর সময় পৃথিবীতে ছিল রাজশক্তির প্রবল প্রভাব। তাই তার স্বর্গ একটি আর্দশ রাজ্য যেখানে ঈশ্বর জ্যোতির্ময় আসনে উপবিষ্ট আর দেবদূতেরা তার স্তুতিতে মুখর। স্বর্গে অমৃতের নদী প্রবাহিত ও তা অভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত। দেড়হাজার বছর আগে আরবে ছিল ব্যাপক মদ্যপানের প্রচলন। গনগনে রৌদ্রের মধ্যে মরুভূমিতে সব সময় সুশীতল পানি ছিল অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই ইসলামের স্বর্গে রয়েছে সুশীতল পানির নহর এবং পবিত্র মদ (শরাবান তাহুরা)। মরুভূমিতে জনজীবন প্রচণ্ড তাপমাত্রায় প্রায়ই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই ইসলামের নরকে রয়েছে অগ্নি, প্রচণ্ড উত্তাপ। স্বর্গ-নরক তথা পরকালে এমন কিছুই পাওয়া যাবে না, যা পৃথিবীতে বসে কল্পনা করা অসম্ভব।

প্রায় সকল ধর্মেই আমরা স্রষ্টার প্রেরিত পুরুষের সন্ধান পাই। তবে তাঁদের অনেকেই মিথ বা গুজবের সৃষ্টি, কেউ ভণ্ড আবার কেউ মানসিক রোগী। অনেকে আবার এমন তপস্যায় মেতে উঠেছিলেন যে মানসিক ভারসাম্য না হারানোটাই ছিল অস্বাভাবিক। অনুসারিরা কোনো কালেই তাঁদের সমালোচনা সহ্য করেনি। ফল হিসাবে ইতিহাসে কখনো তাদের দোষগুলো আসে না; বিশেষ করে যখন আবার কেউ বিজয়ী রাজা হয়ে যান। এছাড়া ধর্মপ্রচারকদের জীবন ইতিহাস তার অনুসারিরাই তৈরি করেন বলেই তারা ইতিহাসে মহানপুরুষে পরিণত হন। ধর্মবাদীরা তাদের ধর্মের মহাপুরুষদের জীবনকে ঘিরে একটা ইন্দ্রজাল তৈরিতে সদাব্যস্ত। একটা উদাহরণ দেয়া যাক :— হজরত মুহম্মদের জীবনীকারকগণ তাঁর নিষ্পাপতা প্রমাণ করার জন্য বলে থাকেন,—ফেরেশতারা কয়েকবার হজরতের 'সিনা সাক' বা বক্ষবিদারণ করে হৃৎপিণ্ডের জমা রক্ত যা 'শয়তানি প্রণোদনার উৎস', তা পবিত্র পানি দ্বারা ধোয়ে পরিষ্কার করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ধারণাটি হাস্যকর। তখনকার ধারণা ছিল, মানুষের আত্মা বক্ষস্থলে বা হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করে। আজ আমরা জানি, মানুষের সকল ধরনের চিন্তা বা অনুভূতির আশ্রয় মস্তিষ্ক। হৃৎপিণ্ড ধোয়ে পাপ-চিন্তা সরানো অসম্ভব, এর জন্য প্রয়োজন 'ব্রেন সাক'! নৃবিজ্ঞান বলছে 'শয়তান ও ফেরেশতা' তখনকার সেমেটিক বাজে চিন্তার ফসল। হজরতের জীবনযাত্রা প্রণালী মুসলমানদের কাছে অনুসরণীয়। কিন্তু শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, যুদ্ধে স্ত্রী সাথে নেয়া, পালক পুত্রের স্ত্রী বিয়ে করা, চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কেটে ফেলা, ব্যাভিচারিকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা—এগুলোর সমর্থনে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।
প্রত্যেক ধর্মের স্বতন্ত্র ধর্মশাস্ত্র রয়েছে; হিন্দুদের 'বেদ', 'গীতা', 'উপনিষদ', মুসলমানদের 'কোরান', খ্রিস্টানদের 'বাইবেল', ইহুদিদের 'তৌরাত', বৌদ্ধদের 'ত্রিপিটক', শিখদের 'গ্রন্থসাহেব'। ধর্মশাস্ত্রগুলো যেহেতু অনেক পুরোনো তাই এগুলো আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে বিরোধপূর্ণ হতেই পারে। কিন্তু বর্তমানে এগুলোকে বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য ধর্মবাদীরা গলদঘর্ম হয়ে পড়েছেন। তারা শাস্ত্রের কথাগুলোকে ইচ্ছেমত অপব্যাখ্যা করে, অর্থের পরিবর্তন করে বিজ্ঞানময় করে তুলতে চাচ্ছেন। কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাসীরা ধর্মশাস্ত্রের হিজিবিজি কথার মধ্যে 'গভীর তত্ত্বের' খোঁজ পান। আবার কেউ কেউ দাবি করেন তাদের ধর্মগ্রন্থ সকল বিজ্ঞানের উৎস। কিন্তু কোনো কিছু আবিষ্কারের পরপরই তারা তা ধর্মশাস্ত্রে খোজাখুঁজি শুরু করেন এবং অল্পকাল পরে তা পেয়েও যান (!) এবং তারও কিছু পরে ধর্মশাস্ত্রের কিছু কথার ব্যাখ্যা এমনভাবে দেন যাতে মনে হয় এর আবিষ্কারক ঐ ধর্মশাস্ত্রটিই। কিন্তু আবিষ্কার হওয়ার আগে কেন ঐ বিষয়টি ঐ ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়নি? এ বিষয়ে ধর্মবাদীরা কেন জানি নিরুত্তর। এখনো বিজ্ঞানে সবকিছু আবিষ্কার হয়নি; তাই ধর্মবাদীরা যদি দয়াপরবশ শাস্ত্র ঘাঁটাঘঁটি করে অনাবিষ্কৃত বিষয়গুলো আগেই বের করে দেন, তাহলে তাদের দাবির সত্যতা নিয়ে অনেকেরই সংশয় কমে যাবে!

ধর্মগ্রন্থ পাঠের বা পাঠ শোনার সময় ধর্মাবলম্বিদের তথাকথিত অদ্ভুত 'স্বর্গীয়' অনুভূতি হতেই পারে, কেননা ঐ ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি রয়েছে তাদের অগাধ বিশ্বাস, ভয় বা সম্ভ্রম—যা তাদের মস্তিষ্কের নিউরনগুলোকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে; এটা অলৌকিক নয়, মানসিকবিভ্রম মাত্র। ধর্মগ্রন্থগুলোতে নিত্য নতুন অলৌকিকতা আবিষ্কারে ধর্মবাদীরা খুবই পারঙ্গম—যা অজ্ঞ ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য প্রহেলিকা সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ধর্মবাদী দাবি করেন:- "তাদের শাস্ত্র অনুবাদ পড়ে বোঝা যাবে না"। প্রশ্ন হল, কেন? পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান মানুষ বিনিময় করেছে, অর্জন করেছে অনুবাদের মাধ্যমে, কোথাও বিশেষ কোন সমস্যা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। হ্যাঁ, অনুবাদের সময় দুয়েকটা শব্দের বা কথার একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়, যা তখন উল্লেখ করলেই হল। যে কোনো ধর্মবিশ্বাসীদের সিংহভাগই তাদের ধর্মগ্রন্থের মূল ভাষা জানেন না, অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়। মজার কথা হল, ধর্মবিশ্বাসীরা তাদের নিজ নিজ ভাষায় যতই ধর্মশাস্ত্র চর্চা (বুঝে অথবা না-বুঝে) করে থাকেন না কেন তাতে কোন সমস্যা হয় না, কিন্তু যখনই কেউ ধর্মশাস্ত্র নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেন বা সন্দেহ প্রকাশ করেন ঠিক তখনই ধর্মবাদীরা এ 'ওজর' তোলেন।

অনেকে আবার দাবি করেন তাদের ধর্মগ্রন্থ এমন শ্রেষ্ঠ—এর মতো কোনো গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। তাদের প্রতি প্রশ্ন—কোন দিক থেকে ধর্মগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ আর কে সেটা নিরুপণ করবেন? কোনো গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও সাহিত্যমান দ্বারাই এর মূল্যায়ন করা হয়। ধর্মগ্রন্থগুলোর সাহিত্যমানের সার্বিক মূল্যায়ন করলে তা আহামরি কিছু বলে মনে হয় না। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও শাস্ত্রগুলো এতই দুর্বল যে, বলা যেতে পারে এঁদের চেয়ে জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ যে কোনো ভাষায় অসংখ্য পাওয়া সম্ভব। এছাড়া ধর্মশাস্ত্রগুলোতে আদৌ কোনও জ্ঞান আছে কি না তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ, কেননা যেকোনো জ্ঞানের স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণ প্রয়োজন যা শাস্ত্রগুলো সরবরাহ করতে অক্ষম। তাই ধর্মগ্রন্থ থেকে মানুষ কখনো সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে পারে না। এগুলো মানুষকে শুধু অজ্ঞ-আবেগপ্রবণ আর অসহিষ্ণু করে তোলতে পারে। মানুষের মুক্তির জন্য মানুষকেই বিধান তৈরি করতে হবে আর তা হতে হবে মানবীয় জ্ঞানের আলোকে, তথাকথিত কোনো 'ঐশ্বরিক শাস্ত্রের' ধুয়া তুলে নয়।

প্রতিটি ধর্মের নিজ নিজ তীর্থস্থান রয়েছে। এসব স্থানে ভ্রমণে ধর্মবাদীরা নিজেদের পবিত্র করেন, পূণ্য অর্জন করেন। হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রগুলোর মধ্যে চন্দ্রনাথ, লাঙ্গলবন্দ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, নবদ্বীপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রয়েছে জেরুজালেম যা মুসলমানদের কাছেও পবিত্র বটে। মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান মক্কা। প্রতিবছর লক্ষ-লক্ষ হাজি বিপুল অর্থ ব্যয়

করে সেখানে যান। কাবাকে বলা হয় বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর আর হাজিরা আল্লাহর মেহমান বা অতিথি। কিন্তু প্রায়ই অসংখ্য হাজি তাবুতে অগ্নিকাণ্ডে বা পদপিষ্ট হয়ে মারা যান। এইতো বছর দুয়েক আগে ৩৬০ জনের অধিক হাজি শয়তানকে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান। অগ্নিদগ্ধ হয়ে বা পদপিষ্ট হয়ে মারা যাওয়া কেমন, তা একটু ভাবলেই অনুধাবন সম্ভব। আল্লাহর আতিথেয়তা সত্যিই চমৎকার! ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাক-ইসলামি যুগে কাবার ভেতর ৩৬০টি কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি ছিল আর উৎসবের সময় তখনকার লোকেরা নাকি উলঙ্গ হয়ে এর চারদিকে ঘুরত! কিন্তু আজও হাজিরা হজে গিয়ে পরম পবিত্রজ্ঞানে কাবার চারদিকে ঘুরতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন!—কোনো সাদৃশ্য নজরে আসে কি? আরো একটি কথা—নামাজের সময় পশ্চিমদিকে (কাবারদিকে) মুখ করে নামাজ পড়তে হয়। কিন্তু পৃথিবী গোল, তাই কাবার বেশ দূরবর্তী এলাকা থেকে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া এক কথায় অসম্ভব; গ্লোব মানচিত্র দেখলে সহজেই বুঝা যাবে। এটা অনেকের মাথাতেই আসে না!

ধর্মগুলো আরেকটি ব্যাপারে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ আর তা হল, নারীদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা; এবং তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা। ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মমতে আদমের প্রয়োজনেই তাঁর এক বক্র হাড় থেকে 'হাওয়া' বা 'ইভে'র উৎপত্তি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মনুসংহিতায় স্বয়ং মনু বলেছেন (৯:১৮): নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ। নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ॥ অর্থাৎ—মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীলোকদের সংস্কার নেই, এরা ধর্মজ্ঞ নয়, মন্ত্রহীন এবং মিথ্যার ন্যায় (অশুভ)। ইসলাম ধর্মমতে, "পুরুষ নারীর রক্ষাকর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন" (সুরা নিসা, ৪:৩৪), "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার" (সুরা বাকারা, ২:২২৩)। বেহেশতেও নারীদের সমঅধিকার নেই। সেখানে পুরুষদের জন্য যে সত্তরজন হুরের ব্যবস্থা আছে অনুরূপ ব্যবস্থা নারীর জন্য অনুপস্থিত। বিবাহের ক্ষেত্রেও ধর্মগুলোর নীতি সম্পূর্ণই অমানবিক। ইসলাম মতে, "মুশরিক রমণী যে পর্যন্ত না বিশ্বাস করে তোমরা তাকে বিয়ে করো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মবিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার চেয়ে ভালো" (সুরা বাকারা, ২:২২১)। অন্যান্য ধর্মগুলোতেও ভিন্ন ধর্মের কারো সাথে বিবাহ-বন্ধন গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া ধর্মগুলো পুরুষের বহুবিবাহকে অনুমোদন করেছে। এ ধরনের ব্যবস্থা একটি সভ্যসমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ।

প্রত্যেক ধর্ম অনেকগুলো শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। হিন্দু ধর্মে আবার অনেক কাল আগে থেকেই বর্ণবাদ চলে আসছে। হিন্দু ধর্ম চারটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আবহমান কাল থেকেই নানারূপ নির্যাতন করে আসছে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। একমাত্র ব্রাহ্মণরা ব্যতীত অন্য কেউ ধর্মশাস্ত্র পাঠ করতে, এমনকি পাঠ শুনতেও পারত না। হিন্দুশাস্ত্রে মনু বলছেন (মনুসংহিতা, ৪:৮১), "যো হ্যস্য ধর্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্। সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥" অর্থাৎ—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্মোপদেশ প্রদান করবেন, তিনি সে শূদ্রের সহিত 'অসংবৃত' নামক নরকে নিমগ্ন হবেন। খ্রিস্টানদের প্রধান প্রধান শাখাগুলো হল, রোমান ক্যাথলিক, অর্থডক্স, প্রোটেস্টান্ট, অ্যাংলিকান। এদের এক শাখার প্রচণ্ড বিরোধ রয়েছে অন্য শাখার সাথে। মুসলমানরাও বেশ কিছু শাখায় বিভক্ত; যেমনঃ সুন্নি, শিয়া, আহলে হাদিস, কাদিয়ানি। এদের মধ্যে এতই বিরোধ রয়েছে যে, কোনো কোনো শাখা অন্য শাখাকে মুসলিমই মনে করে না। প্রধান শাখা সুন্নি আবার চারটি মজহাবে বিভক্ত, যাদের মধ্যে প্রচুর মতের অমিল রয়েছে। শিয়ারাও অনেক শাখায় বিভক্ত। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতিটি শাখাই মনে করে তারাই ঐ ধর্মের একমাত্র সঠিক অনুসারী!

পরিশেষে একটি কথা না বললেই নয়—আসুন আমাদের যারা ধর্মবিশ্বাসী তারা সবাই নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করি এবং এ বিষয়ে মুক্তভাবে চিন্তা করে দেখি তা কতটা গ্রহণীয়। বর্তমান বিশ্ব যখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দর্শনে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে সেখানে আমরা যদি কতগুলো অপবিশ্বাস নিয়ে বসে থাকি তবে তা আমাদের জন্য খুব একটা মঙ্গল বয়ে আনবে না। বদ্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে মুক্তচিন্তার দিকে আসা হল আমাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ। আমরা যদি অযৌক্তিক বিশ্বাসকে রেখে কোনো বিষয় চিন্তা করি তবে তা ঐ বিশ্বাস দ্বারাই পরিচালিত হবে, তাতে সমস্যা শুধু বাড়বেই। তাই আমাদেরকে প্রথমেই মুক্তচিন্তক হতে হবে, বুঝতে হবে যুক্তি। আসুন আমরা যুক্তির পথে, মুক্তচিন্তার পথে অগ্রসর হই, জীবনের সবক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রয়োগ ঘটাই। এতেই আমাদের জীবন আনন্দময় ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।